وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ই'তিছাম

الإعتصام

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং এর একটি তুলে নেওয়া হলে অপরটিও তুলে নেওয়া হয়'

(ছহীহ আদাবুল মুফরাদ, হা/১৩১৩; ছহীহ তারগীব তারহীব, হা/২৬৩৬)।

● ৭ম বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● ফেব্রুয়ারি ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٧، رجب و شعبان ١٤٤٤ هـ/ فبراير ٢٠٢٣م العدد: ٤ ، الجزء :٧٦
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

হালিল-উর-রহমান মসজিদ, উরফা প্রদেশ, তুরস্ক : এই মসজিদটি সর্বপ্রথম খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৪ সালে গির্জা হিসেবে নির্মিত হয়। পরবর্তিতে আব্বাসীয় খলীফা মামূন-উর-রশীদ (রহি.)-এর শাসনামলে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) তা মসজিদে রূপান্তর করা হয়। সুলতান সুলেমান (রহি.)-এর শাসনকালে (১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) মসজিদটির পুরো কাঠামো সংস্কার করা হয়। মসজিদের অনিন্দ্যসুন্দর মিনারটি সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (রহি.)-এর ভাগ্নে মুযাফফর উদ্দীন মূসা (রহি.) ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ ‖ ঈসায়ী ২০২৩ ‖ বঙ্গীয় ১৪২৯

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ফেব্রুয়ারি	০৯ রজব-শা'বান	বুধবার	০৫.২২	০৬.৩৯	১২.১২	০৩.২২	০৫.৪৫	০৭.০২
০৫ ,,	১৩ ,,	রবিবার	০৫.২০	০৬.৩৭	১২.১২	০৩.২৪	০৫.৪৮	০৭.০৪
১০ ,,	১৮ ,,	শুক্রবার	০৫.১৮	০৬.৩৪	১২.১৩	০৩.২৬	০৫.৫১	০৭.০৭
১৫ ,,	১২ ,,	বুধবার	০৫.১৫	০৬.৩১	১২.১২	০৩.২৮	০৫.৫৪	০৭.১০
২০ ,,	২৮ ,,	সোমবার	০৫.১২	০৬.২৭	১২.১২	০৩.৩০	০৫.৫৭	০৭.১২
২৫ ,,	০৪ শা'বান	শনিবার	০৫.০৮	০৬.২৩	১২.১১	০৩.৩১	০৫.৫৯	০৭.১৪

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-৩	-২	-২
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	০
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২
টাঙ্গাইল	+২	+২	-১
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০
গোপালগঞ্জ	+১	+১	+৩
মাদারীপুর	০	০	+২
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১
শরিয়তপুর	-১	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	+১	-১
শেরপুর	+২	+৩	০
জামালপুর	+২	+৩	+১
নেত্রকোনা	-১	০	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-৩
কক্সবাজার	০	-৮	-৫
খাগড়াছড়ি	-৭	-৮	-৫
রাঙ্গামাটি	-৮	-১০	-৫
বান্দরবান	-৯	-১০	-৮
কুমিল্লা	-৪	-৪	-২
নোয়াখালী	-৪	-৪	-১
লক্ষীপুর	+৩	+৩	+৩
চাঁদপুর	-২	-২	০
ফেনী	-৫	-৫	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৫	-৫	-৭
সুনামগঞ্জ	-৩	-২	-৬
মৌলভীবাজার	-৫	-৫	-৫
হবিগঞ্জ	-৪	-৩	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৮	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮
নাটোর	+৬	+৬	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৪	+২
বগুড়া	+৫	+৫	+৩
নওগাঁ	+৬	+৭	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৭	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৬	+৭	+২
দিনাজপুর	+৮	+৯	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৫	+২
কুড়িগ্রাম	+৪	+৫	+১
লালমনিরহাট	+৫	+৬	+১
নীলফামারী	+৮	+৯	+৪
পঞ্চগড়	+৯	+১০	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৯	+১০	+৫

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	+১	+৪
সাতক্ষীরা	+৪	+৪	+৭
যশোর	+৪	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৪	+৪	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৩	+৩	+৪
নড়াইল	+৩	+৩	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-১	+২
পটুয়াখালী	-১	-২	+২
পিরোজপুর	০	০	+৩
ঝালকাঠি	-১	-১	+২
ভোলা	-২	-৩	+১
বরগুনা	-১	-১	+৩

৭ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৯
রজব-শা'বান
১৪৪৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ

» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-৯) ০৩
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১৫তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২২তম পর্ব) ০৬
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» নারীরা কেন একাধিক পুরুষের সাথে একত্রে সংসার করতে পারবে না ১০
-সাঈদুর রহমান

» লায়লাতুল মি'রাজ : করণীয় ও বর্জনীয় ১২
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন

» 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' নিয়ে বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৫
-মো. হাসিম আলী

» এইডস : ইসলামই যার একমাত্র সমাধান ১৭
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» ক্ষমার আদর্শে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০
-এম. আব্দুল মাজেদ মারুফ

» আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ২১
-মাযহারুল ইসলাম

» ইলম অর্জনকারী ও প্রদানকারীর ফযীলত ২৩
-আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে

» আল্লাহর যিকিরের ফযীলত ও ফলাফল ২৬
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ তরুণ প্রতিভা

» কালিজিরা : ঔষধ নাকি নিরাময়ক? *-ওমর বিন শফিক* ২৯

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ

» বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মূলনীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৩০
-মো. হাসিম আলী

◈ দিশারী

» কিছু হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ *-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান* ৩৪

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা ৩৬

» গ্রন্থ পরিচিতি-১৪ : সুনানে নাসাঈ
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩৮

» ইশ! যদি করতাম! *-সাব্বির আহমাদ*

◈ কবিতা ৩৯

◈ সংবাদ ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মানুষ আল্লাহ তাআলার অসীম নেয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে। তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নির্মল স্বচ্ছ পরিবেশ, অক্সিজেন, অর্থসম্পদ, বসতবাড়ি, যানবাহন, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি সবই আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। আবেগ, অনুভূতি ও মনের ইচ্ছা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম বাকশক্তি। আল্লাহ মানুষকে বাকশক্তি তথা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বর্ণনা শিখিয়েছেন' *(আর-রহমান, ৫৫/৩-৪)*। ভাষা আল্লাহ তাআলার এক অমূল্য নেয়ামত। কিন্তু আমরা কত অকৃতজ্ঞ! এত নেয়ামত ভোগ করেও আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না!

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার যেমন সম্মান আছে, আল-কুরআনের ভাষা হিসেবে তেমনি আরবীরও বিশেষ অবস্থান আছে। ভাষা শহীদদের সম্মানে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে ফুল প্রদান, শোভাযাত্রা করা, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ অনুষ্ঠান বা ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদি করা হয়। এর মাধ্যমে ভাষার প্রতি দায়িত্ব পালিত হয় না। কেননা ১৫০০ বছর পূর্বে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ভাষার মূল্যায়ন করেননি।

বর্তমানে আমাদের তরুণ শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশ বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলার পরিবর্তে বাংলিশ তথা বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। একটি বক্যের কিছু অংশে বাংলা শব্দ আর কিছু অংশে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে তারা। ভাষার এমন ব্যবহার ভাষা অবমাননার শামিল। এতে ব্যক্তির হীনম্মন্যতা ও সংকীর্ণতা প্রকাশ পায়। মাতৃভাষাকে চর্চা করতে হবে গর্বের সাথে। নিজের ভাষা উচ্চারণে যদি কেউ সংকোচবোধ করে, তবে বুঝতে হবে ভাষার প্রতি তার ভালোবাসার অভাব আছে এবং ভাষাদিবসে তার অংশগ্রহণ লোক দেখানো। এমনভাবে ভাষাদিবসের উদযাপন মোটেও কাম্য হতে পারে না।

আরব্য কিংবা পশ্চিমারা নিজ ভাষার শব্দ ব্যতীত অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করে না। তারা যে অন্য ভাষা জানে না তা নয়; কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসার নিদর্শন এটি। আরবরা কম্পিউটারের পরিবর্তে 'হাসুব' আর রেডিওর পরিবর্তে 'ইযাআ' শব্দের ব্যবহার করে; অথচ আমরা ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করি। তারা আমাদের মতো মাতৃভাষার জন্য কোনো দিবস পালন করে না; কিন্তু মাতৃভাষায় কথা বলতে হীনম্মন্যতায় ভোগে না। জার্মানি, চাইনিজ, জাপানি ও ইংরেজদের অবস্থাও এমনই।

বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক সম্পদশালী ও জ্ঞানী মানুষ আছে, যারা বিদেশী ভাষা জানে তবুও সে ভাষায় কথা বলে না। আর আমাদের দেশের এক শ্রেণির তরুণ দুই লইন ইংরেজি শিখেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। নিজেকে শিক্ষিত হিসেবে প্রকাশ করতে তারা এমনটি করে থাকে। এ ধরনের আচরণ ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষকে কুরআন ও হাদীছ শিখানোর আরবী ভাষা শেখে থাকেন। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া তারা আরবী বলেন না। ভাষার জন্য শহীদদের জীবন উৎসর্গ তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা বাংলা ভাষার যথাযথ চর্চা করব।

আল্লাহর নেয়ামতের অপব্যবহারে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা আর সদ্ব্যবহারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ভাষা আল্লাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যাবলি সম্পাদনে ভাষা ব্যবহার করা হয়। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আল্লাহর ইবাদত, তাঁর প্রশংসা ইত্যাদি ভালো কাজে আমরা এর ব্যবহার করি না। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, মিথ্যা কথা, অন্যায় কাজ ও গাল-মন্দ করা ইত্যাদিতে আমরা ভাষার ব্যবহার করি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (লজ্জাস্থান) সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৪; মিশকাত, হা/৪৮১২)*।

ভাষা আল্লাহ তাআলার মহিমান্বিত গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা। বিশ্ববাসীর নিকট ইসলাম প্রচারে আরবরা কুরআনের আরবী ভাষাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে। পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার বহু মানুষ ইসলামের প্রভাবে আরবী ভাষাভাষী হয়ে ওঠে। ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসাই তাদের আরবী ভাষাভাষী করেছে। ইসলামের পাশাপাশি কুরআনের ভাষা আরবীকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে তারা তাদের মাতৃভাষা এবং পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে *(আল-লুগা আরাবিয়া ওয়া মাকানাতুহা বায়নাল লুগাত, ১/২)*।

দীর্ঘকাল ধরে আরবী ভাষাই ছিল পৃথিবীর প্রথম সভ্য ভাষা। আরবী ভাষা হলো প্রাচীনতম ভাষা যা এখনও শব্দ, গঠন, রূপতত্ত্ব, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং রূপক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। আরবী অভিধানের সম্পূর্ণতা এবং রূপতত্ত্ব ও ব্যাকরণের পরিপূর্ণতার বিচারে একে আরব উপদ্বীপে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষাগুচ্ছের জননী বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে পরিচিতি ভাষা আরবী। উৎস, সুবিধা এবং বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী *(আবকারিয়্যাতুল লুগা ওয়াল আরাবিয়া, পৃ. ৭-৮)*।

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়)

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৯)

দলবাজদের আরেকটি স্পষ্ট বিধিনিষেধ হচ্ছে, **'গোপনীয়তা'**।

'অতএব, স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আহলুস সুন্নাহগণ অনুসরণকারী আর বিদ'আতীরা নিত্য-নতুন বিষয় প্রকাশকারী, যেসব ব্যাপারে কোনো দলীল নেই। **সেকারণে তারা তাদের বিদ'আত লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহগণ তাদের মাযহাব লুকিয়ে রাখেন না।** তাদের বক্তব্য খোলাখুলি, তাদের মাযহাব প্রসিদ্ধ এবং শেষ পরিণতি তাদেরই'।[১]

ইমাম আহমাদ 'আয-যুহদ' কিতাবে *(পৃ. ৪৮)* এবং দারেমী তার 'সুনানে' *(১/৯১)* উমার ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الْقَوْمَ يَتَنَاجَوْنَ فِي دِينِهِمْ دُونَ الْعَامَّةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ 'যখন কোনো সম্প্রদায়কে দ্বীনী বিষয়ে জনগণকে বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে দেখবেন, তখন জানবেন যে, তারা কোনো ভ্রষ্টতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছে'।

ইবনুল জাওযী তার 'তালবীসু ইবলীস' কিতাবে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। এর টীকাগ্রন্থ 'আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস'-এর ৮৯ পৃষ্ঠায় আমি লিখেছি, 'আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের দ্বীন স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, যেখানে কোনো গোপনীয়তা, অস্পষ্টতা নেই; নেই কোনো ষড়যন্ত্র বা গোপন ভেদ। সুতরাং দলবাজরা এগুলোর মধ্যে যা যা করছে, তার সবই কেবলই ভ্রষ্টতা। আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই'।

আপনি খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবেন, যখন দেখবেন— তারা কুরআন বা সুন্নাহ থেকে তাদের গোপনীয়তার পক্ষে দলীল গ্রহণের অপচেষ্টা করছে। অথচ চূড়ান্ত গবেষণায় সেগুলো একটাও তাদের পক্ষে যায় না। যেমন— সূরা আল-আম্বিয়ার ৬২-৬৩ নম্বর আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক মূর্তি ভাঙার বিষয়টি গোপন রাখার কথা এসেছে। সূরা গাফেরের ২৮-২৯ নম্বর আয়াতে ফেরাউনের বংশের মুমিন ব্যক্তিদের ঈমান গোপন রাখার কথা এসেছে।

কুরআনে বর্ণিত এজাতীয় অন্যান্য ঘটনাও তারা দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। অনুরূপভাবে তারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাক্কী জীবনে দাওয়াতী কাজের গোপন পর্বকেও দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। তারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীটিও দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে: اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ 'তোমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সফল করতে তোমাদের গোপনীয়তার সাহায্য নাও'।[২]

এসব দলীলের জবাবে বলা যেতে পারে, শেষেরটি ছাড়া বাকী সবগুলোই মুসলিমদের দুর্বল অবস্থা এবং ইসলামের কথা প্রকাশ্যে বলতে ভয়ের অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট। তাছাড়া 'সেগুলোর বেশিরভাগই বিশেষ অবস্থা মেনে চলার উপর নির্ভরশীল ছিল, যেগুলো তারা অহির মাধ্যমে পেয়েছিলেন'।[৩] অথবা সেগুলো এমন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন একজন দাঈর নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেওয়ার সামর্থ্য থাকে না।

শেষের হাদীছটির ব্যাপারে বলব, এটি এ স্থানের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ হাদীছটির শেষে একটি বাক্য রয়েছে, যা দলীল গ্রহণকারী বিলুপ্ত করে দিয়েছে। বাক্যটি হচ্ছে, فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ 'নেয়ামতপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হিংসার শিকার'। বিলুপ্ত অংশটি দলীলের সঠিক দিকটি স্পষ্ট করে। অর্থাৎ এখানে গোপনীয়তা রক্ষা করা বলতে হিংসুকের হিংসার ভয়ে নেয়ামত গোপন করা এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা না করার কথা বলা হয়েছে।

গোপনীয়তা আজ দুইভাবে উম্মতকে টুকরো টুকরো করে ছাড়ছে:

(১) বিভ্রান্ত আইন-কানুনের ধ্বজাধারী ভ্রষ্ট সরকার, যারা নিজেদের ক্ষমতার চেয়ার হারানোর ভয় পায়, তারা সেসব ব্যক্তিকে শক্ত হাতে দমন করে, যাদের ব্যাপারে তারা গোপনীয়তার আভাস পায়। আর যারা গোপনীয়তা চর্চা করে এবং বাস্তবায়ন করে, তাদেরকে তো দমন করেই। এভাবে সরকারের সাথে ফাটল তৈরি হয়।

(২) তারা মুসলিমদের মধ্যে গভীর গর্ত তৈরি করে, তাদের কাছ থেকে এমন কিছু লুকায়, যা লুকানো জায়েয নেই; এমন কিছু গোপন করে, যা গোপন করা জায়েয নেই। ফলে অন্তরগুলো অন্ধকার হয়ে যায়; হৃদয়গুলো হয়ে যায় কালো। এভাবে জনগণের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়।

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস, পৃ. ৪০।

২. ছহীহুল জামে', হা/৯৪৩।

৩. মুহাম্মাদ আবু রহীম, 'আস-সির্রিয়্যাহ ওয়া আছারুহা ফী আদাইল মাহাম আল-আসকারিয়্যাহ', পৃ. ২৬।

এই দুটি বিষয়ই দাঈদের এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা 'দাওয়াতের মূলনীতি কুরআন, সুন্নাহ ও মানুষের হস্তলিখিত অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থে ঘোষিত ও প্রচারিত হয়েছে। ফলে প্রকাশ্য সেই দাওয়াতী কার্যক্রমকে প্রথম যুগের দাওয়াতী কার্যক্রমের গোপন স্তর হিসেবে উপস্থাপন করে ইসলামী আন্দোলনগুলোর গোপনীয়তা অবলম্বনের পেছনে কোনো কৈফিয়ত আছে বলে আমি মনে করি না। বরং বলা যায়, **অনন্তকালের জন্য দাওয়াতের গোপন স্তর শেষ হয়ে গেছে।** কারণ এই দ্বীন প্রকাশ্যরূপ লাভ করেছে, পূর্ণতা পেয়েছে এবং এর গোপনীয়তা শেষ হয়ে গেছে'।[৪]

বর্তমান যুগের ইতিহাস তো বটেই, এমনকি অতীত ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যায়, যেখানেই অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তা আছে, সেখানেই শরী'আতের নানান ধরনের বিরোধিতা রয়েছে। আর যেখানেই লুকিয়ে থাকা ও গোপনীয়তা অবলম্বনের ব্যাপার রয়েছে, সেখানেই ভীতি ভর করে এবং নিরাপত্তা চলে যায়।

ইসলাম তার স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও নির্মলতা নিয়ে এসবকিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। ফলে কোনো বাস্তবতাকে লুকানোর, কোনো পথকে গোপন করার এবং কোনো কর্মপন্থাকে অস্পষ্ট করার সুযোগ এখানে নেই।

'গোপনীয়তার দিকে আহ্বান কেবল দাওয়াতী কার্যক্রমের শত্রুদের মোকাবিলা করে ক্ষান্ত থাকে না এবং থেমে থাকে না ইসলামী দাওয়াতের দরজার নিকটে; বরং তা স্বার্থরক্ষার নামে বহু পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। ফলে গোপনীয়তার দিকে আহ্বান এখন বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপনের এবং যোগ্য লোকদের নেতৃত্বের জায়গা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়েছে। ইসলামী কার্যক্রমের শত্রুরা নয়; বরং ইসলামী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টরাই গোপনীয়তার দিকে আহ্বানের প্রথম বলির পাঠায় পরিণত হয়েছে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, গোপন ও বাতেনী দাওয়াতী কার্যক্রমগুলো ইসলামের সাথে কত ষড়যন্ত্র যুক্ত করেছে এবং এসব দাওয়াতী কার্যক্রমের চিন্তাচেতনা ও আক্বীদার সাথে কত বিভ্রান্তি ও পদস্খলন যুক্ত হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, এসব গোপন দাওয়াতী কার্যক্রম নিজেদের অস্তিত্ব, গোপনীয়তা[৫] ও নিরাপত্তা রক্ষার নামে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ ধরে চলে, যার দরুন সেখানে সংশোধন, আলোচনা-পর্যালোচনা ও ফলাফল সংগ্রহের কোনো রাস্তা থাকে না'।[৬]

আপনারা আমার সাথে আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একথাটি চিন্তা করুন:

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ

'আমি তোমাদেরকে আলোকিত দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত তার দিনের মতোই উজ্জ্বল। নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দ্বীন ছেড়ে বিপথগামী হবে'।[৭]

এটাই গন্তব্য, এটাই দলীলের মাধ্যম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিভক্তি (اَلْاِفْتِرَاقُ) ও দলাদলি (اَلْحِزْبِيَّةُ)-এর মধ্যে সম্পর্ক

আলেমশ্রেণি ও ইলম অন্বেষণকারী ছাত্রবৃন্দের নিকট একথা অস্পষ্ট নয় যে, বিভক্তি ও দলাদলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও মজবুত সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য যেখানেই দলাদলি আছে, সেখানেই বিভক্তি আছে। আর যেখানেই বিভক্তি ভর করেছে, সেখানেই দলাদলি গড়ে উঠেছে।

বিভক্তির জড় বহু পুরোনো। যখনই এর সামান্য আভাস নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়েছিলেন, তখনই তিনি এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ছহীহ বুখারীর ৩৫১৮, ৪৯০৫ ও ৪৯০৭ নম্বর হাদীছে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির ছাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরগণের মধ্যে একজন অত্যন্ত আমুদে ছিলেন। তিনি কৌতুকচ্ছলে একজন আনছারীর কোমরে আঘাত করলেন। তাতে আনছারী ছাহাবী ভীষণ রেগে গেলেন এবং উভয়ে গোত্রীয় সহযোগিতার জন্য নিজ নিজ লোকদের ডাকলেন। আনছারী ছাহাবী বললেন, হে আনছারীগণ! মুহাজির ছাহাবী বললেন, হে মুহাজিরগণ! সাহায্যে এগিয়ে এসো। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, জাহেলী যুগের হাঁকডাক কেন?! তারপর বললেন, তাদের কী হয়েছে? অতঃপর মুহাজির কর্তৃক আনছারীর কোমরে আঘাতের কথা তাকে জানানো হলো।

রাবী বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ **'এ জাতীয় হাঁকডাক ত্যাগ করো, এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ'।**

---

৪. গযবান, আল-মানহাজ আল-হারাকী লিস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ১/৩৩। যুহাইর সালেম রচিত 'আছারাত ওয়া সাক্বাতাত' বইয়ের ৩৩ পৃষ্ঠার সাথে তুলনা করে দেখতে পারেন।

৫. যে কোনো কর্ম, যা গোপনীয়তা ও মাটির নিচে কাজ করার স্বভাবে ভূষিত, তা যদি নিজের মধ্যে যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা আছে বলে মনে করে এবং তার প্রতিপক্ষ কখনই সেখানে সুঁই ঢুকাতে পারবে না বলে বিশ্বাস করে, তাহলে বুঝতে হবে— তা উদাসীনতায় বিভোর রয়েছে। অন্ধকার গোপন মাধ্যমগুলোই অদ্ভুত সব বীজ বপন করে থাকে এবং মাটির নিচে অন্ধকার কাজ করে থাকে, যেগুলোর প্রকৃতি অজ্ঞাত... *(দ্র. খালেছ হালাবী, ফিন নাক্বদিয যাতি, পৃ. ৪১)*।

৬. নাযারাত ফী মাসীরাতিল আমাল আল-ইসলামী, পৃ. ৩৮-৩৯।

৭. হাদীছটি হাসান, 'আল-আরবাঊনা হাদীছান ফিদ-দাওয়াতি ওয়াদ-দু'আত' বইয়ে আমি হাদীছটির তাখরীজ করেছি, হা/৬, দারু ইবনিল ক্বাইয়িম, দাম্মাম।

ইমাম মুসলিমও উল্লিখিত বর্ণনাকারী থেকে এমনটা বর্ণনা করেছেন *(হা/২৫৮৪)*।

'মুহাজির ও আনছার এই দু'টি নামই শারঈ নাম, কুরআন ও সুন্নাহ যে নাম দু'টি উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ যেমন আগে ও এই কুরআনে আমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন, তেমনি এই নাম দু'টিও তিনিই রেখেছেন। মুহাজির ও আনছার নাম দু'টির দিকে কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধিত হওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে উত্তম ও প্রশংসনীয়। **পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলের দিকে সম্বন্ধিত হওয়ার মতো বৈধ বিষয় এটি নয়; অনুরূপভাবে কোনো বিদ'আত বা পাপের দিকে সম্বন্ধিত হওয়ার মতো মাকরূহ বা হারামও এটি নয়।**[৮] এতদসত্ত্বেও উভয় দল যখন এটাকে পুঁজি করে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটা অপছন্দ করেছেন এবং সেটাকে জাহেলী হাঁকডাক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন'।[৯]

তারপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে সঠিক দিকটি তুলে ধরেন 'এবং তাদেরকে মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহর বান্দা হিসেবে একে অপরকে আহ্বানের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। **বিভক্তি** সৃষ্টিকারী শব্দ অমুক-তমুকের বিপরীতে **এটাই মূলত সংযোগ স্থাপনকারী আহ্বান।** আল্লাহই সাহায্যস্থল।'[১০]

জাহেলী ডাকের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, 'যেমন কোনো গোত্রের দিকে আহ্বান, কোনো ব্যক্তির অন্ধভক্তির দিকে আহ্বান। কোনো মাযহাব, দল বা শায়খের প্রতি অন্ধভক্তিও অনুরূপই। স্রেফ খেয়ালখুশি ও অন্ধভক্তির কারণে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেওয়াও অনুরূপ। এভাবে নিজে কোনো দিকে সম্বন্ধিত হয়ে সেদিকে (মানুষকে) ডাকা, **এর উপর মিত্রতা বা শত্রুতা স্থাপন করা এবং এর উপর মানুষকে মাপা** ইত্যাদি সবই জাহেলী ডাকের অন্তর্ভুক্ত'।[১১]

সবগুলো আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, 'বিভেদ যে রকমেরই হোক না কেন, মতভেদ যার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠুক না কেন তা ইসলামের প্রকৃতির সাথে মিলে না এবং তা উপকার ও কল্যাণ বয়ে আনার চেয়ে মুসলিমদের জন্য ক্ষতি ও অকল্যাণই বেশি বয়ে আনে। ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ "এতদুভয়ের উপকারের চেয়ে পাপই বড়" *(আল-বাক্বারা, ২/২১৯)*। এর মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি'।[১২]

অতএব, 'দ্বীনের মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তি বলতে যেমন আক্বীদা ও শরী'আতের ভেতরকার মতভেদ বুঝায়, তেমনি একই ধর্মাবলম্বীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিভিন্ন জামা'আত ও দলের বিভক্তিও বুঝায়— এই বিভক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তি যা-ই হোক না কেন। কুরআন-হাদীছের অনেক বক্তব্যের দাবিও কিন্তু তাই। মহান আল্লাহ বিবাদ ও মতভেদ করতে উন্মুক্তভাবে নিষেধ করেছেন এবং এটিকে মুসলিমদের দুর্বলতা তৈরি ও শক্তি খর্ব হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ 'আর তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে' *(আল-আনফাল, ৮/৪৬)*। সকল প্রকার ঝগড়া বুঝানোর জন্য আল্লাহ এখানে ঝগড়া-বিবাদ কথাটিকে কোনো ধরনের লাগাম ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

তারপর মহান আল্লাহ কেবল ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য ঘটে গেলে ভুল শোধরানোর ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা ব্যয় করা আবশ্যক করেছেন। আবশ্যক করেছেন বিভেদ উঠাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখতে এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি বিষয়ের উপর একমত হতে। **তিনি তাদেরকে সুযোগ দেননি মতভেদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দল গঠন করতে** এবং পরস্পরবিরোধী মতামত পেশ করতে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও— যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা' *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। এখানে মহান আল্লাহ বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে নিষেধ করে কোনো একটি দিক ছেড়ে কোনো একটি দিকের প্রতি একমত হওয়ার বিশেষ নির্দেশ দেননি; বরং আদেশ-নিষেধ উভয়কে উন্মুক্ত রেখেছেন। ফলে তা রাজনৈতিক, সামাজিক সবক্ষেত্রেই আবশ্যক, যেমনিভাবে আক্বীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আবশ্যক'।[১৩]

তাহলে বুঝা গেলো, বিভেদ ও দলাদলিকে মানুষের দৃষ্টিতে যতই ঠুনকো মনে হোক না কেন এবং চিন্তাবিদদের চোখে যতই তুচ্ছ মনে হোক না কেন এ দু'টি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

(চলবে)

৮. একথার মাধ্যমে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, যার বিস্তারিত বিবরণের জায়গা এটি নয়।

৯. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইয়িমাহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম, ১/২১১।

১০. মাদারিজুস সালেকীন, ২/৩৭০।

১১. ইবনুল ক্বাইয়িম-এর বক্তব্য থেকে, যা 'তাইসীরুল আযীযিল হামীদ' গ্রন্থকার ইবনুল ক্বাইয়িম থেকে উল্লেখ করেছেন, পৃ. ৫১৫।

১২. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৩৪।

১৩. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৩৫-৩৬।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১৫তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২২তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

অনুবাদ :

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আবদান হাদীছ শুনিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছে, তিনি যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আরো হাদীছ শুনিয়েছেন বিশর ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইউনুস ও মা'মার হাদীছ শুনিয়েছেন, তারা যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে। তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রামাযানে তিনি আরো বেশি দানশীল হতেন, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রামাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।]

অপরিচিত শব্দ : جود (জূদ) শব্দের সাথে সাধারণ দানের পার্থক্য আছে। জূদ সাধারণ দানের চেয়ে উঁচু স্তরের। জূদের মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকে যা সাধারণ দানের মধ্যে থাকে না। সাধারণ দান ও জূদ-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে-

(১) কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার পর দান করা হলো সাধারণ দান। আর না চাইতেই নিজে অনুভব করে খুঁজে প্রদান করার নাম জূদ, যাতে গ্রহণকারীকে ছোট হতে না হয়।

(২) জূদ মূলত অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা ও দুনিয়াবিমুখতা। দানের পরিমাণ কম হলেও অন্তরের প্রশস্ততার কারণে জূদ হয়।

(৩) সাধারণ দানে তাকে দানশীল বলা হয়, যে বেশি দান করতে পারে। কিন্তু জূদের ক্ষেত্রে পরিমাপ কোনো ধর্তব্য নয়। একজন ১ লক্ষ টাকার মালিক, সে যদি ১০ হাজার টাকা দান করে, আর আরেকজন ১০ টাকার মালিক সে যদি ৯ টাকা দান করে বা পুরোটাই দান করে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো, তাহলে উভয়ের মধ্যে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো দানই জূদ বলে গণ্য হবে।

রামাযানে বেশি দান করার কারণ : রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য মাসের তুলনায় রামাযান মাসে বেশি দান করতেন। কেননা অন্য মাসের তুলনায় রামাযান মাসে তিনি ফেরেশতার সাহচর্য বেশি লাভ করতেন। পাশাপাশি পবিত্র কুরআন তথা মহান আল্লাহর বাণীর বেশি সংস্পর্শে থাকতেন, যেহেতু প্রচুর পরিমাণে কুরআন পড়া হতো। আবার ফেরেশতার সঙ্গে কুরআন পড়তেন। ফলে অহির প্রভাব অন্তরে তাজা থাকত। পাশাপাশি যেহেতু মাসটি বরকতময় রামাযান মাস, এজন্য রামাযান মাসের প্রভাবও অন্তরে কাজ করত। এই তিনটি কারণের সংমিশ্রণে তার অন্তরে যে ঈমানী জাযবা বিরাজ করত, তারই ফলশ্রুতিতে তিনি এভাবে দান করতেন।

দখিনা হাওয়ার চেয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দান কীভাবে বেশি উপকারী হয় : দখিনা বাতাস সকলের পরিবেশ ও অবস্থা অনুভব করে প্রবাহিত হয় না। বরং ঢালাওভাবে সকলের নিকটে পৌঁছে যায়। তার ফলে কারো কারো উপকার হয় আবার কারো ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে যায়। আবার কোনো গাছ বা ফল নষ্টও হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করে থাকেন মানুষের অবস্থা বুঝে। ফলে যোগ্য জিনিসকে যোগ্য জায়গায় পৌঁছানো তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্য তার সহযোগিতা দ্বারা মানুষের শুধুই উপকার হয়, কোনো ক্ষতি হয় না।

দখিনা বাতাস শুধু মানুষকে শারীরিক প্রশান্তি দিতে পারে। আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহযোগিতা মানুষকে আত্মিক ও শারীরিক সব ধরনের প্রশান্তি দেয়। তিনি যেমন টাকা দিয়ে দুনিয়াবী কাজে সহযোগিতা করেন, ঠিক তেমনি বিভিন্ন সৎ পরামর্শ দিয়ে আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা করেন, যা তার সহযোগিতাকে দখিনা বাতাসের চেয়েও বেশি উপকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে।

হাদীছ থেকে উপকারিতা :

(১) যিকিরের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী যিকির হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত। এজন্য জিবরীল আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একত্রিত হতেন, তখন কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

(২) সৎসঙ্গীর কাছে মাঝেমধ্যে যাওয়া ভালো, তাতে ঈমান নবায়ন ও তাজা হয়।

(৩) সৎ মানুষেরা যেখানে একত্রিত হন, সেই মজলিসে বেশি বেশি দান করা ভালো।

(৪) রামাযানে কুরআন মাজীদ পড়ে একবার হলেও শেষ করা উচিত।

হাদীছ নং : ৬

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ، هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ.

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ সারমর্ম অনুবাদ :

তৎকালীন বিশ্বে দুই পরাশক্তি ছিল রোম ও পারস্য। রোম বলতে ইউরোপ বুঝায়। যারা মূলত খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিল। সিরিয়া, মিশর ও ফিলিস্তীন পর্যন্ত তাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে ফারসী ভাষায় যারা কথা বলে তাদেরকে ফারিস বা ফুরস বলা হয়। সেটাকেই বাংলায় পারস্য লেখা হয়। ইরানের সাম্রাজ্যই মূলত পারস্য সাম্রাজ্য। পারস্যরা ছিল অগ্নিপূজক মাজূসী। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। তাদের ক্ষমতার প্রভাব বলয়ে যেহেতু মক্কা-মদীনাও ছিল এবং মক্কা-মদীনার রাজনীতিও যেহেতু অনেকটাই তাদেরকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান থাকত, তাই তাদের যুদ্ধের জয়-পরাজয় নিয়ে আরবেও চর্চা হতো। রোম সাম্রাজ্য ঈসায়ী খ্রিষ্টান ধর্ম তথা একটি আসমানী ধর্মের অনুসারী হওয়ায় মুসলিমরা তাদেরকে ভালোবাসত এবং পারস্যের অগ্নিপূজকরা মুশরিক হওয়ায় মক্কার কাফের-মুশরিকরা তাদের পক্ষ নিত। ইসলাম আবির্ভাবের প্রাক্কালে

এক যুদ্ধে রোমানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আরব এলাকা থেকে রোমানদেরকে বিতাড়িত করে পারসিকরা রোম সম্রাটকে তুরস্কের কুসতুনতুনিয়া বা ইস্তাম্বুলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। উক্ত ঘটনায় মুসলিমরা অনেক কষ্ট পায় এবং মুশরিকরা অনেক খুশি হয়। তখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা আর-রূম অবতীর্ণ করেন। যেখানে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পুনরায় রোমানদের বিজয় হবে এবং তারা বায়তুল মাক্বদিস পারসিক অগ্নিপূজকদের থেকে উদ্ধার করবে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে মক্কার কাফের-মুশরিকরা হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বদর যুদ্ধ বিজয়ের বছর রোমানগণ পারসিকদের পরাজিত করে বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার করে।

অন্যদিকে হিজরতের পর থেকে মক্কার কাফের-মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের ছোট-বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকে। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে উভয় দলই যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে হালকা বিশ্রাম পায়। ফলশ্রুতিতে মক্কার কাফের-মুশরিকদের নেতা আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একটি ব্যবসায়ী দল ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়। অন্যদিকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য দূত পাঠানো শুরু করেন।

এই দিকে রোমান প্রধান কায়ছার মানত মেনেছিলেন যে, বায়তুল মাক্বদিস উদ্ধার করতে পারলে তিনি পায়ে হেঁটে বায়তুল মাক্বদিস যাবেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালীন সময় তিনি সেই মানত পূরণ করতে বায়তুল মাক্বদিস চলে আসেন। ঠিক সেই সময়েই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত দিহইয়া আল-কালবী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি নিয়ে প্রথমে বাছরা যান, সেখান থেকে বায়তুল মাক্বদিস পৌঁছান সরাসরি কায়ছারের দরবারে। ঠিক সেই সময়েই আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যবসায়ী দলও বায়তুল মাক্বদিস পৌঁছে। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুঅতের খবর আগে থেকেই কায়ছারের নিকট ছিল। এখন তার চিঠি পেয়ে তিনি আরো ভালোভাবে সেই নবীর বিষয়ে জানতে চান। তাই চিঠি পড়ার আগেই বিষয়টি তাহক্বীক্ব (বিশ্লেষণ) করার জন্য তিনি আরবের ব্যবসায়ী দলকে ডেকে পাঠান। তাদের মধ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় কে তা জেনে নিয়ে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সামনে বসান এবং কাফেলার সদস্যদেরকে তার পিছনে বসান। আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি মিথ্যা বলে, তাহলে কাফেলার বাকী সদস্যরা সেটার বিরোধিতা করবে মর্মে কায়ছার নির্দেশ প্রদান করেন। যেহেতু স্বাভাবিকভাবে আরব বিশ্বে মিথ্যাকে চরম ঘৃণ্য বিষয় হিসেবে দেখা হয়, সেক্ষেত্রে কোনো গোত্রপ্রধান যদি মিথ্যুক প্রমাণিত হয়, তাহলে তার সম্মান বলতে কিছুই বাকী থাকে না। আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের সম্মানের খাতিরেই এবং তার সঙ্গী-সাথীদের নিকট তিনি যেন মিথ্যুক না হন এজন্য তিনি কোনো মিথ্যা উত্তর প্রদান করেননি।

নিম্নে হিরাক্লিয়াসের সাথে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথোপকথন হাদীছের আলোকে তুলে ধরা হলো—

হিরাক্লিয়াস : তোমাদের মধ্যে যিনি নবুঅতের দাবি করেছেন, তার বংশ কেমন?

আবূ সুফিয়ান : তিনি আমাদের মধ্যে উঁচু বংশের সন্তান।

হিরাক্লিয়াস : তার পূর্বে সেই বংশে কেউ কি নবুঅতের দাবি করেছিল?

আবূ সুফিয়ান : না! করেনি।

হিরাক্লিয়াস : নবুঅতের দাবিদার সেই ব্যক্তির বাপ-দাদার মধ্যে কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিল।

আবূ সুফিয়ান : না! ছিল না।

হিরাক্লিয়াস : তার অনুসরণ যারা করেন, তারা কি উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ বংশের, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ না সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষ?

আবূ সুফিয়ান : যারা সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষ তারা তার অনুসরণ করে।

হিরাক্লিয়াস : তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে?

আবূ সুফিয়ান : দিন দিন বাড়ছে।

হিরাক্লিয়াস : তার আনীত দ্বীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে আসে?

আবূ সুফিয়ান : না! সেই দ্বীনে একবার প্রবেশ করলে কেউ বের হয়ে আসে না।

হিরাক্লিয়াস : নবুঅতের দাবি করার পূর্বে তাকে কি কখনো মিথ্যা বলতে দেখা গেছে?

আবূ সুফিয়ান : না! নবুঅত দাবি করার পূর্বে তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি।

হিরাক্লিয়াস : তিনি কি কখনো ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন?

আবূ সুফিয়ান : না! তিনি কখনো ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেননি। তবে বর্তমানে তার সাথে আমাদের একটা চুক্তি চলমান আছে। এটার বিষয়ে উনি কী করবেন তা বলতে পারছি না।

হিরাক্লিয়াস : তার সাথে কি তোমাদের কখনো যুদ্ধ হয়েছে?

আবূ সুফিয়ান : হ্যাঁ! যুদ্ধ হয়েছে।

হিরাক্লিয়াস : যুদ্ধের ফলাফল কী?

আবূ সুফিয়ান : যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির মতো। কখনো আমাদের হাতে আমরা পানি তুলেছি আর কখনো তার হাতে তিনি পানি ভর্তি করেছেন।

হিরাক্লিয়াস : তিনি তোমাদের কী বিষয়ে আদেশ দেন? তার মৌলিক শিক্ষা কী?

আবূ সুফিয়ান : তার শিক্ষা হচ্ছে, শিরক করো না। এক আল্লাহর ইবাদত করো, যে সমস্ত শিরকী কথা ও কাজ তোমাদের বাপ-দাদারা করে এসেছেন, তা পরিত্যাগ করো, ছালাত আদায় করো, সত্য বলো, যাকাত আদায় করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, হারাম সম্পর্ক থেকে নিজেকে পবিত্র রাখো।

জিজ্ঞাসাবাদের পর হিরাক্লিয়াসের মন্তব্য :

উপরের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর প্রতিটি উত্তরের উপর হিরাক্লিয়াস মন্তব্য পেশ করেন।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, নবুঅতের দাবিদার ব্যক্তির বংশ কেমন? তুমি উত্তরে বলেছ, তিনি উঁচু বংশের। আর জেনে রাখো! নবীগণ উঁচু বংশেই প্রেরিত হয়ে থাকেন।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তার পূর্বে সেই বংশে কেউ কি নবুঅতের দাবি করেছিল? তুমি উত্তরে বলেছ, করেনি। যদি তার পূর্বে কেউ নবুঅতের দাবি করে থাকত, তাহলে আমি ভবতাম তিনি তার দেখাদেখি এই কাজ করেছেন।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, নবুঅতের দাবিদার সেই ব্যক্তির বাপ-দাদার মধ্যে কেউ রাজা-বাদশাহ ছিল কি-না? তুমি উত্তরে বলেছ, ছিল না! আর জেনে রাখো, যদি তার বংশে পূর্বে কেউ রাজা-বাদশাহ থাকত, তাহলে আমি ভাবতাম তিনি সেই হারানো রাজত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য এই পথ ধরেছেন।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, নবুঅতের দাবি করার পূর্বে তাকে কি কখনো মিথ্যা বলতে দেখা গেছে? তুমি উত্তরে বলেছ, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। আর জেনে রাখো! যে ব্যক্তি মানুষের বিষয়ে মিথ্যা বলেন না, তিনি কীভাবে আল্লাহর বিষয়ে মিথ্যা বলবেন?

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তার অনুসরণ যারা করে তারা কি উচ্চ শিক্ষিত, উঁচু বংশের, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ না সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষ? তুমি উত্তরে বলেছ, দুর্বল শ্রেণির মানুষ। আর জেনে রাখো! নবীদের অনুসরণ প্রথমে দুর্বল স্তরের মানুষেরাই করে থাকে।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে? তুমি উত্তরে বলেছ, দিন দিন বাড়ছে। আর জেনে রাখো! ঈমানের অবস্থা এমনই! দিন দিন তার অনুসারী বাড়তেই থাকবে যতক্ষণ না পূর্ণতা পায়।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তার আনীত দ্বীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে আসে? তুমি উত্তরে বলেছ, না। আর জেনে রাখো! ঈমানের স্বাদ যে একবার পায় সে তা থেকে ফিরে আসে না।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি কি কখনো ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? তুমি বলেছ, না। আর জেনে রাখো! নবীগণ ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করেন না।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কী? তুমি উত্তরে বলেছ যে, যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির মতো, কখনো আমাদের হাতে আমরা পানি তুলেছি আর কখনো তার হাতে তিনি পানি ভর্তি করেছেন। আর জেনে রাখো! নবীদের সাথে প্রথম প্রথম এমনই হয়। কেননা মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। কিন্তু শেষ সফলতা তাদেরই হয়।

হিরাক্লিয়াস : আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি তোমাদের কী বিষয়ে আদেশ দেন? তুমি উত্তরে বলেছ যে, তার শিক্ষা হচ্ছে, শিরক করো না, এক আল্লাহর ইবাদত করো, যে সমস্ত শিরকী কথা ও কাজ তোমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে তা পরিত্যাগ করো, ছালাত আদায় করো, সত্য বলো, যাকাত আদায় করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, হারাম সম্পর্ক থেকে নিজেকে পবিত্র রাখো। জেনে রাখো! যদি তার শিক্ষা এগুলোই হয়, তাহলে একদিন আমার পায়ের নিচে যে মাটি আছে (বায়তুল মাক্বদিস) তাও তাঁর করতলগত হবে। আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম শেষনবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসার সময় হয়েছে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্যে আসবেন তা জানতাম না। যদি আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে আমি তার নিকট পৌঁছাতে পারব তাহলে তার নিকট পৌঁছার জন্য যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতাম আর আমি যদি তার কাছে হতাম, তাহলে তার পা ধুয়ে দিতাম।

(চলবে)

সূচিপত্র

নারীরা কেন একাধিক পুরুষের সাথে একত্রে সংসার করতে পারবে না

-*সাঈদুর রহমান**

আল্লাহ তাআলা পুরুষদের একত্রে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু একথা বলেননি যে, চারজন বিয়ে করতেই হবে। তিনি অনুমোদন দেওয়ার সাথে সাথে পুরুষদের সতর্কবার্তাও প্রদান করেছেন, যেন তারা কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীদের ওপর সীমালঙ্ঘন না করে। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ 'তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ করো' *(আন-নিসা, ৪/৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 'হে ঈমানদারগণ! জোর জবরদস্তি করে নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না; যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে অপছন্দ করছ' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 'তোমরা যত ইচ্ছে কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনোই পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না; যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আন-নিসা, ৪/১২৯)*।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ 'যে ব্যক্তি দু'জন স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ল, ক্বিয়ামতের দিন সে কাঁধ ঝোলানো অবস্থায় উপস্থিত হবে'।[১] একজন ছাহাবী এসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব কী? তিনি বলেন, أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ 'তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে'।[২]

কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে না পারে তাহলে তার জন্য একাধিক বিয়ে করা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা ঢালাওভাবে সকল পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেননি, বরং শর্তসাপেক্ষে দিয়েছেন। যারা এ শর্ত পূরণ করতে পারবে, তারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে, নচেৎ নয়।

এখন শুনুন, কেন নারীরা একত্রে একাধিক পুরুষ গ্রহণ করতে পারবে না তার গোপন রহস্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনে নারীদের সাদৃশ্য দিয়েছেন শস্য খেতের সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র সদৃশ। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যখেতে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার' *(আল-বাক্বারা, ২/২২৩)*।

একটা উদাহরণ দিই, কোনো একটি খেতে চারজন লোক একত্রে শস্যের বীচি ছিটিয়ে দিল। এখন চারা অঙ্কুরিত হওয়ার পর তারা কি বলতে পারবে কার বীচি থেকে চারা উৎপন্ন হয়েছে, আর কার বীচি থেকে হয়নি? কখনো পারবে না। নারীদের জরায়ু হলো একটা ঝিনুকের ন্যায়, যে ঝিনুক অধীর আগ্রহ নিয়ে বৃষ্টির অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে। যখনই আল্লাহর হুকুমে আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি পতিত হয়, তখন ঝিনুক এক ফোঁটা পানি নিয়ে গভীর পানিতে ডুব দেয়।

এক ফোঁটা পানি থেকে আবিষ্কৃত হয় মণিমুক্তা, যা আমরা অঢেল অর্থ দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে এসে প্রিয়জনকে উপহার দিই। নারীর জরায়ুতে উপযুক্ত সময়ে এক ফোঁটা বীর্য পতিত হওয়ার সাথে সাথে ঝিনুকের ন্যায় জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এখন কথা হলো কোনো নারীর সাথে যদি চারজন পুরুষ একত্রে সহবাস করে তাহলে নারী বুঝবে কীভাবে যে কার বীর্য দ্বারা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? বিশেষ করে ওই চারজন পুরুষ যদি কপট প্রকৃতির হয় তাহলে তারা সবাই বলবে এই সন্তান তার বীর্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি।

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আবূ দাঊদ, হা/২১৩৩, হাদীছ ছহীহ।

২. আবূ দাঊদ, হা/২১৪২, হাদীছ হাসান।

পরবর্তীতে এই সন্তানটি কাকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিবে? কে তার দেখভাল করবে? কার কাছে সে মাথা গোঁজার স্থান পাবে? এই সন্তান সকলের নিকট অবহেলার পাত্রে পরিণত হবে। সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। সমাজের মধ্যে এই সন্তান মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। কারো সামনে বুক টান করে কথা বলতে পারবে না। কেউ তাকে গ্রহণ করবে না। কারণ তার পিতৃপরিচয় নেই; নেই তার বংশের নাম-নিশানা।

বংশ পরিচয় যেন পৃথিবী থেকে বিলীন না হয়ে যায় এজন্য ইসলাম নারীদের একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেয়নি। তবে ইসলাম নারীদের অনুমতি দিয়েছে যে, স্বামী তাকে ছেড়ে দিলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে। পুরুষরা হলো স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো, যেখানে ইচ্ছে তারা তাদের উৎপাদিত জিনিস ফেলতে পারে; কিন্তু নারী তা পারে না। প্রশ্ন আসতে পারে, এই ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা তাদের দেননি কেন? নিম্নের দুটি আয়াত দেখুন,

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ 'আর তোমরা ওসবের আকাঙ্ক্ষা করো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। পুরুষরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ আছে এবং তোমরা আল্লাহরই নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী' *(আন-নিসা, ৪/৩২)*। আল্লাহ একই সূরাতে একটি আয়াত পরে বলেন, ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দান করেছেন এজন্য যে, তারা স্বীয় ধনসম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে' *(আন-নিসা, ৪/৩৪)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ 'আর তাদের উপর (স্ত্রীদের) রয়েছে পুরুষের প্রাধান্য' *(আল-বাক্বারা, ২/২২৮)*।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি বুঝেন মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনের কথা। একটা নারী প্রতি মাসে ৭/৮ দিন অসুস্থ থাকে। অসুস্থ থাকাবস্থায় স্বামী তার মনোবাসনা পূরণ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন, ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ 'ঋতুস্রাবাস্থায় নারীদের থেকে দূরে থাকো। পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না। পবিত্র হলে আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবে আসো (সহবাস করো)' *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*।

এখন কথা হলো স্ত্রীর অসুস্থাবস্থায় যদি স্বামীর কামবাসনা জাগ্রত হয় তাহলে স্বামী কী করবে? যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, না-কি বৈধ পন্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করে মনোবাসনা পূরণ করবে? একটি মহিলার উদরে সন্তান চলে আসলে একটা সময় তার সাথে আর সহবাস করা যায় না। এই অবস্থা চলতে থাকে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। সন্তান প্রসব করার পর আরও ৪০ দিন স্বামীকে অপেক্ষা করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা এজন্য চার পর্যন্ত বিয়ে বৈধ করেছেন, যেন তাঁর বান্দারা অবৈধ কর্মে লিপ্ত না হয়।

ইসলাম মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। মানুষের অন্তর্নিহিত কথা আল্লাহ বুঝেন। আর এজন্যই তার প্রণীত প্রত্যেকটি বিধি মানুষের জন্য কল্যাণকর ও হৃদয়ঙ্গম। কিন্তু আমরা মানুষরা আমাদের অপ্রতুল জ্ঞান দিয়ে তা অনুধাবন করতে পারি না, পারলেও নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় বিধায় মানতে নারাজ। প্রশ্নবিদ্ধ করি ইসলামকে, সমালোচনার তীক্ষ্ম তীর ছুড়ি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে। অনেক বিষয় আছে যা আমাদের চর্মচোখে চিত্তাকর্ষক মনে হয়, অথচ আল্লাহর নিকট তা বিদঘুটে। আল্লাহর তাআলা এরশাদ করেছেন, ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ 'তোমরা অনেক বিষয় অপছন্দ মনে কর, অথচ এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আবার অনেক বিষয় পছন্দ করো, অথচ এতে রয়েছে ক্ষতি' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৬)*।

বর্তমানে তরুণীদের স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়ে বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছে কিছু ইসলামবিদ্বেষী মহল। নারী স্বাধীনতার নামে তাদের রাস্তায় নামাচ্ছে। নিরাপদ দুর্গ থেকে নিয়ে যাচ্ছে উন্মুক্ত মাঠে-প্রান্তরে। অযাচিত অনর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করে নারীদের মগজ ধোলাই করে দিচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী ভোগ করা। নারীদের বেহায়া বেলেল্লাপনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুকৌশলে শ্লীলতাহানি করছে। নারীরা আজ শ্লোগান দিচ্ছে, 'আমার দেহ, আমার মন, যাকে ইচ্ছা তাকে দেব'। অথচ তার এই দেহটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। একমাত্র এটা ভোগ করবে তার স্বামী। এই বিপথগামী নারীদের কে বুঝাবে? কে তাদের ফিরিয়ে আনবে প্রখর রোদ থেকে ছায়াতলে? যত দিন যাচ্ছে তত বিপথগামী হচ্ছে নারীরা। এখন নারীরা হরহামেশা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, ইতোপূর্বে যার সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াতের দীপ্তিময় আলোয় আলোকিত করুন- আমীন!

লায়লাতুল মি'রাজ : করণীয় ও বর্জনীয়

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাত তথা মি'রাজ উপলক্ষ্যে আমাদের সমাজে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ইবাদত পালন করা হয়- যদিও মি'রাজের দিন-তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন— ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। আসলে এগুলোর কুরআন ও সুন্নাহতে ভিত্তি আছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো খেয়াল করা হয় না। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

মি'রাজের রাতে নফল ছালাত :

অনেক মুসলিম ভাই-বোনেরা মি'রাজ উপলক্ষ্যে কেউ ১২ রাকআত, কেউ ২০ রাকআত ছালাত আদায় করে থাকেন। ইসলামী শরীআতে মি'রাজের ছালাত বলে কিছু নেই। নফল ছালাত পড়া ছওয়াবের কাজ কিন্তু মি'রাজ উপলক্ষ্যে নফল ছালাত আদায় করার কোনো ভিত্তি বা প্রমাণ ইসলামে নেই। কাজেই মি'রাজের নামে নফল ছালাত আদায় করা এবং এর ব্যবস্থা করা মানে ইসলামী শরীআতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করা। আর এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমাদের ধর্মে এমন কিছু সংযুক্ত বা উদ্ভাবন করবে, যা তার (শরীআতের) অংশ নয়— তা প্রত্যাখ্যাত হবে'।[১]

এ সংক্রান্ত কয়েকটি জাল হাদীছ:

(১) আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনিতে মাগরিবের ছালাতের পর ২০ রাকআত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাছ পড়বে...'। অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি মাওযূ বা জাল।[২]

(২) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ২৭ রজব (অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রিতে) ইবাদত করবে, তার আমলনামায় ১০০ বছরের ইবাদতের ছওয়াব লেখা হবে'।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের ছালাতের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এটি প্রমাণযোগ্য নয়।[৩]

(৩) একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন হাদীছের দৃষ্টান্ত, اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'ছালাত হলো মুমিনদের মি'রাজ'।[৪]

আল্লামা ইবনু রজব, ইবনু হাজার আসক্বালানী, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছ একবাক্যে বলেছেন, রজব মাসে বিশেষ কোনো ছালাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ ছালাত আদায় করলে বিশেষ ছওয়াব পাওয়া যাবে— এ মর্মে একটি হাদীছও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল। কেননা, এসবই বানোয়াট।[৫]

মি'রাজ ও নফল ছিয়াম :

আমাদের অনেক মুসলিম ভাই-বোন লায়লাতুল ক্বদরের সাথে মিলিয়ে মি'রাজেও নফল ছিয়াম রেখে থাকেন। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— নফল ছিয়াম যখন ইচ্ছা তখন রাখা যায়। কিন্তু কোনো উপলক্ষ্যে নফল ছিয়াম রাখতে হলে অবশ্যই আগে জেনে নিতে হবে যে, আমি বা আমরা যে উপলক্ষ্যে নফল ছিয়াম রাখছি শরীআত সেটাকে অনুমতি দিয়েছে কিনা। মি'রাজ উপলক্ষ্যে নফল ছিয়াম রাখার কোনো বর্ণনা কুরআন-হাদীছের কোথাও বর্ণিত নেই। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীগণ এই দিনে বিশেষভাবে কোনো ছিয়াম রেখেছেন এমন কোনো বর্ণনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এই দিনে মি'রাজ উপলক্ষ্যে ছিয়াম রাখা কোনো ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। মি'রাজের নফল ছিয়াম সম্পর্কে অসংখ্য জাল হাদীছ এসেছে। যেমন-

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. ছহীহ বুখারী, ১/৩৭১।

২. কিতাবুল মাওযূআত, ২/১২৩।

৩. গোলাম রহমান, মাহে মি'রাজ, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃ. ২২।

৪. মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফযিলত, পৃ. ১২৩।

৫. আল-মাসনূ, পৃ. ২০৮।

(১) আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ অর্থাৎ মি'রাজ দিবসে ছিয়াম পালন করবে, তার আমলনামায় ৬০ মাসের ছিয়ামের নেকী লেখা হবে'।

(২) আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নামে বর্ণিত জাল হাদীছে আছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাকি বলেছেন, 'রজব মাস আল্লাহর মাস, শা'বান মাস আমার মাস এবং রামাযান মাস উম্মতের মাস। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের ছিয়াম পালন করবে তার জন্য আল্লাহর মহা সন্তোষ অবধারিত হয়ে যাবে এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিবেন...। যে ব্যক্তি রজব মাসে ২ থেকে ১৫টি ছিয়াম পালন করবে, তার নেকী পাহাড়ের মতো হবে... সে কুষ্ঠ, শ্বেত ও পাগলামি রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ...জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। ...জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা থাকবে'।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি জাল।[৬]

(৩) 'রজব মাসের ২৭ তারিখ আমি নবুঅত পেয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিনে ছিয়াম রাখবে, তা তার ৬০ মাসের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে'।[৭]

(৪) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ২৭শে রজবের সকাল থেকে ই'তিকাফ আরম্ভ করতেন। যোহর পর্যন্ত ছালাতে মাশগূল থাকতেন, যোহরের পর অমুক অমুক সূরা দিয়ে চার রাকআত বিশেষ ছালাত আদায় করতেন এবং আছর পর্যন্ত দু'আতে থাকতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।[৮]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রজব মাসে ছিয়াম রাখা সংক্রান্ত সবগুলো হাদীছ দুর্বল; বরঞ্চ মাওযূ (বানোয়াট)। আলেমগণ এর কোনোটির উপর নির্ভর করেন না। ফযীলতের ক্ষেত্রে যে মানের দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করা যায়, এটি সে মানের নয়। বরং এ সংক্রান্ত সবগুলো হাদীছ মাওযূ (বানোয়াট) ও মিথ্যা।[৯] ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আজলুনী, আব্দুল হাই লাখনবী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭শে রজবের ফযীলত, এ তারিখের রাতের ইবাদত, দিনে ছিয়াম পালন বিষয়ে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট, জাল ও ভিত্তিহীন।

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রজব মাসে ছিয়াম রাখা ও নফল ছালাত পড়ার ব্যাপারে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলো মিথ্যা'।[১০] ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রজব মাসের ফযীলত, এ মাসে ছিয়াম রাখা বা এ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে ছিয়াম রাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। অথবা এ মাসের বিশেষ কোনো রাত্রিতে ছালাত পড়ার ব্যাপারে ছহীহ কোনো হাদীছ নেই।[১১] সাইয়েদ সাবেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্য মাসগুলোর উপর রজব মাসের বিশেষ কোনো ফযীলত নেই। তবে এটি হারাম মাসসমূহের একটি। এ মাসে ছিয়াম রাখার বিশেষ কোনো ফযীলত কোনো ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। এ বিশেষ যে কয়টি বর্ণনা রয়েছে, এর কোনোটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়।[১২] শায়খ উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ-কে ২৭শে রজব ছিয়াম ও ক্বিয়াম পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন, 'সবিশেষ মর্যাদা দিয়ে ২৭শে রজব ছিয়াম ও ক্বিয়াম পালন বিদআত। আর প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রান্তি'।[১৩] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মি'রাজের ঘটনার পর প্রায় ১১ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় কখনো 'মি'রাজ দিবস' পালিত হয়নি। ছাহাবায়ে কেরাম কখনো তা পালন করেননি। তাই এ উপলক্ষ্যে ছিয়াম রাখা সুস্পষ্ট বিদআত।

রজবে উমরা পালন :

মুসলিমদের কোনো কোনো উপদল রজব মাসকে বিশেষভাবে উমরা পালনের মাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাস এর রয়েছে প্রভূত ফযীলত এবং পরকালীন পুরস্কার। প্রকৃত সত্য ও শুদ্ধ মত হলো রজব অন্যান্য মাসের অবিকল, তার বিশেষত্ব নেই অন্য মাসের তুলনায়। তাতে উমরা পালনের বিশেষ কোনো ফযীলত বর্ণনা করা হয়নি। উমরা পালনের ক্ষেত্রে সময়সংশ্লিষ্ট

৬. কিতাবুল মাওযূআত।
৭. তাবঈনুল আযাব, পৃ. ৬৪; তানযীহ, ২/১৬১।
৮. আল-আসার, আবদুল হাই লখনবী, পৃ. ৭৮।
৯. ইবনু তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ, মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৫/২৯০।
১০. আল-মানারুল মুনীফ, পৃ. ৯৬।
১১. তাবঈনুল আযাব, পৃ. ১১।
১২. সাইয়েদ সাবেক, ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩৮৩।
১৩. শায়খ উছায়মীন, মাজমূউ ফাতাওয়া, ২০/৪৪০।

আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রামাযান মাস এবং হজ্জে তামাত্তুর জন্য হজ্জের মাসগুলো। এ মাসগুলোয় উমরা পালনের বিশেষ ফায়দা হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। হাদীছের কোথাও এ স্বীকৃতি পাওয়া যায় না যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ মাসে উমরা পালন করেছেন। তাছাড়া, বিষয়টিকে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন।

রজব মাস উপলক্ষ্যে পশু যবেহ একটি জাহেলী কুসংস্কার :

ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে রজব মাসে মুশরিকদের মধ্যে স্বীয় দেবতা/প্রতীমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার একটি রেওয়াজ ছিল। একে 'আতীরা' বলা হতো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই শিরকী রেওয়াজের মূলোৎপাটন করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এখন 'ফারা' এবং 'আতীরা' নেই।[১৪] ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ কেউ বলেন, 'ফারা' বলা হয় উটের প্রথম ভূমিষ্ঠ বাচ্চাকে। প্রাচীন আমলে লোকেরা তাদের উপাস্য ত্বাগূতের জন্য একে বলি দিত। অতঃপর তার গোশত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত, চামড়া ঝুলিয়ে রাখত গাছের ডালে। 'আতীরা' বলা হয় রজবের ১০ তারিখে উপাস্যের উদ্দেশ্যে যে পশু বলি দেওয়া হয়, তা।[১৫]

আজকাল রজব মাসে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহিমাহুল্লাহ-এর মাযারে তার ওফাত উপলক্ষ্যে যে 'উরস' হয়, সেখানে এমন অনেক পশু যবেহ করা হয়, যা মূর্খ লোকেরা খাজা রাহিমাহুল্লাহ বা তার মাযারের নামে মানত করে থাকে। জাহেলী যুগের 'ফারা', 'আতীরা' আর বর্তমানের এসব যবেহকৃত পশুর মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো নামে মানত করা, তা যদি পীর-বুযুর্গের নামেও হয় তবুও তা শিরক। আমাদের দেশেও খাজা আজমীরী রাহিমাহুল্লাহ-এর ওফাতকে কেন্দ্র করে জাহেল লোকেরা এমন সব রসম-রেওয়াজ উদ্ভাবন করেছে, যা কঠোরভাবে পরিহার করে চলা উচিত। বিভিন্ন স্থানে লাল কাপড়ে মোড়ানো বিরাট 'আজমীরী ডেগ' বসানো হয়। কোথাও কোথাও মাযারের আদলে অস্থায়ী মাযার স্থাপন করা হয়। এরপর খাজা আজমীরী রাহিমাহুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে নযর-নিয়ায ও মানতের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ইত্যাদি ওঠানো হয়, যা দেওয়াও হারাম এবং ওখান থেকে কিছু খাওয়াও হারাম। যারা এগুলো উঠায় তারা এগুলো দিয়ে আনন্দ-ফূর্তির আয়োজন করে। ঢোল-তবলা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নাচ-গানের আসর বসায়। যেখানে নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাচ-গান ও খাওয়া-দাওয়ায় অংশ নেয়, অবাধে মেলামেশা করে এবং নানা ধরনের গর্হিত কাজ করে থাকে, যা নিঃসন্দেহে হারাম।

অতএব রজব মাসের সম্মানে বিশেষ ছিয়াম পালন করা, ২৭শে রজবের রাত্রিকে শবে মি'রাজ ধারণা করে ঐ রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা, উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা, যিকির-আযকার, শাবীনা খতম ও দু'আর অনুষ্ঠান করা, মীলাদ ও ওয়ায-মাহফিল করা, ঐ রাতের ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, সরকারি ছুটি ঘোষণা করা ও তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির বিশাল অংকের ক্ষতি করা, ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে মি'রাজের নামে উদ্ভট সব গল্পবাজি করা, মি'রাজকে বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে অনুমানভিত্তিক কথা বলা, ঐ দিন আতশবাজি, আলোকসজ্জা, কবর যিয়ারত, দান-খয়রাত এবং এ মাসের ফযীলত লাভের আশায় উমরা পালন ইত্যাদি সবই বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত।[১৬]

১৪. ইবনু মাজাহ, হা/৩১৬৮; মুখতাছার ছহীহ মুসলিম, হা/১২৬০; ইরওয়া, হা/১১৮০; ছহীহ জামে' আছ-ছাগীর, হা/৭৫৪৪।

১৫. আস-সুনান, ৩/১০৪।

১৬. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃ. ৯।

'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' নিয়ে বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা

*-মো. হাসিম আলী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এসব জ্ঞানপাপীদের জেনে রাখা উচিত :

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম একটি মীমাংসিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী পর্যন্ত রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম বহাল আছে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানের প্রথম ভাগের ২ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। আর সংবিধানের ৭ক-তে (মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য) সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে— 'সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে'।

২. সাংবিধানিকভাবে মীমাংমিত বিষয় নিয়ে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করা, বিভ্রান্তি ছড়ানো, উস্কানি দেওয়া ধৃষ্টতার শামিল।

৩. সংবিধান কখনো কোনো জাতির বোধ-বিশ্বাসের প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। বরং অধিকাংশ মানুষের বোধ-বিশ্বাসকে ধারণ করাই উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

৪. ৯২% মুসলিমের ধর্ম ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হওয়া অযৌক্তিক কিছু নয়। বরং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকাই যৌক্তিক, অধিকতর ইনছাফভিত্তিক।

৫. ভাষা ও ধর্ম উভয়টিই মানুষের জন্য। মানুষের মুখের ভাষা যদি রাষ্ট্রভাষা হতে পারে, তাহলে মানুষের ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হতে বাধা নেই।

৬. ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর ২ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে'। সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনীর ২ক-তেও বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মপালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন'। সংবিধানে এরূপ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরও তাদের চক্রান্ত ও মতলব বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

৭. বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চারণভূমি। এখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, বোধ-বিশ্বাস আলাদা হলেও এ দেশের মানুষ সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করছে আবহমানকাল থেকে। সুতরাং তাদের অভিন্ন জাতীয় চরিত্রের কথা বাস্তবতাবর্জিত এবং অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়।

৮. ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে চারটি মূলনীতি ছিল তা তো সংবিধানের বর্তমান কাঠামোতে পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ৭২-এর সংবিধানের মূলনীতিই বহাল আছে।

৯. সংবিধান তো পরিবর্তনশীল জিনিস। দেশ জাতির কল্যাণে তা একবার দুইবার নয়, শতবার পরিবর্তন হতে পারে। সুতরাং দেশ ও জাতির কল্যাণে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ সাংঘর্ষিক বিষয় নয়; বরং তা সাংঘর্ষিক অবস্থা নিরসনের উপায় হতে পারে।

১০. ১৯৮৮ সাল থেকে এ দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রয়েছে। এতে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকার কারণে তারাও সংখ্যাগুরুদের সমান এবং ক্ষেত্র বিশেষে বেশি অধিকার ও মর্যাদা ভোগের সুযোগ পাচ্ছেন।

১১. রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপরিপন্থী নয়। কারণ ইসলামের পবিত্র বাণী ব্যবহার করেই মুক্তিযুদ্ধ গতি লাভ করেছিল, মুক্তিযোদ্ধারা সাহস ও শক্তি লাভ করেছিল। তাই ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দান দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের স্বার্থেই প্রয়োজন।

১২. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী গণমানুষের সংগঠন এবং একাধিকবার দেশকে নেতৃত্বদানকারী প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল—জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ। এরা প্রত্যেকেই ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল রেখেছে। এদের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

১৩. স্বয়ং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রেখেছেন। তার চেয়ে বেশি বঙ্গবন্ধুপ্রীতি আর কারো থাকতে পারে না।

১৪. রাষ্ট্রধর্ম না থাকলে কিংবা বাদ দিলেই কোনো রাষ্ট্র শান্তি, নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় স্বাধীনতার হোলসেল এজেন্ট হয়ে যায় না, যার বড় প্রমাণ আজকের ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও চীন। সেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিনিয়ত মুসলিম নিধন চলছে।

১৫. ইসলাম মানবতার ধর্ম। এতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। বরং মুসলিমরাই উল্টো সাম্প্রদায়িকতার স্বীকার, যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভারত, মিয়ানমার, ইসরাঈল, চীনে গণহারে মুসলিম নিধন।

যারা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা বিনষ্টের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়, তারা বিশিষ্ট কলামিস্ট এবনে গোলাম সামাদ এবং সৈয়দ আবুল মকসুদের নিম্নবর্ণিত কথা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এবনে গোলাম সামাদ লিখেছেন, 'ধর্মের ইতিহাস ও আবেগকে বাদ দিয়ে আজকের বাংলাদেশের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

করা যায় না। বাংলাদেশে ইসলাম না থাকলে পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশের অস্তিত্ব রচিত হতে পারত না। কারণ, বাঙালি হিন্দুরা চিরকালই ভারতীয় জাতীয়তাবাদে আস্থা রেখেছেন, বাংলা ভাষার ভিত্তিতে কোনো পৃথক দেশ অথবা রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেননি। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ১৯৪৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে— ভারত ও পাকিস্তান। এই দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় হিন্দুত্ব আর মুসলিম চেতনাকে নির্ভর করে। ১৯৭১ সালে আবার পাকিস্তান ভেঙে জন্ম নেয় পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন হতে চেয়েছে, কিন্তু ইসলামী মূল্যবোধ পরিত্যাগ করতে চায়নি'।

গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন, 'বাংলাদেশের যে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ঘোষিত হলো, তা ইসলামহীন সেক্যুলারিজম নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ইসলামসংক্রান্ত অনুষ্ঠান একটু বেশিই যেন প্রচারিত হতো। হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে বিশেষ কিছুই হতো না। কিন্তু কেন তা হতো? তা হতো এই জন্য যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শ্রোতার কাছে ইসলামী অনুষ্ঠানের বিশেষ আবেদন ছিল। যার বিশেষ আবেদন থাকে, তার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ কি সেদিন ধর্মনিরপেক্ষ হতে চেয়েছিল, না-কি অসাম্প্রদায়িক হতে চেয়েছিল? সেদিন বাংলাদেশের ধর্মাবলম্বী-নির্বিশেষে বাঙালি জনগণ চেয়েছিল অতীতের সাম্প্রদায়িক বিষ ধুয়ে-মুছে একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে, সেক্যুলার হতে নয়'।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এর প্রতিটি বিধান ও নির্দেশনা মানুষের জন্য কল্যাণকর। এর অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যেই মানবজাতির প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা' *(আলে ইমরান, ৩/১৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ 'আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তা (আল্লাহর নিকট) গৃহীত হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(আলে ইমরান, ৩/৮৫)*। এ কালজয়ী আদর্শের প্রচার ও প্রসারের জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী, যেখানেই ইসলাম প্রবেশ করেছে, প্রতিষ্ঠান লাভ করেছে, সেখানেই মানুষের জীবনধারায় শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছে। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা যে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও কল্যাণবার্তা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সকল মতাদর্শের উপর ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো। যারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে চায় না তাদের নাম, লেবাস, চেহারা-অবয়ব যা-ই হোক না কেন তারা কখনো ঈমান ও ইসলামের দাবিতে সত্যবাদী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ 'তিনিই সে সত্তা, যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা (অংশীবাদীরা) তা অপছন্দ করে' *(আত-তওবা, ৯/৩৩)*। এ ঘোষণার পাশাপশি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী মুসলিমদের পথ অনুসরণ না করার পরিণতিও তিনি উল্লেখ করেছে এভাবে— ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ 'সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও কেউ যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, তবে আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব' *(আন-নিসা, ৪/১১৫)*। সুতরাং আমাদের উচিত, পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে ধারণ করা এবং নির্দেশনাবলি মেনে নেওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৮)*।

বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আছে এবং থাকবে। এটি ধর্মপ্রাণ ঈমানদার মুসলিমদের প্রাণের দাবি। এর বিরোধিতা করা ধৃষ্টতা ও উস্কানিমূলক আচরণের শামিল। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকা না থাকা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যত কথাই থাকুক না কেন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সাম্য, ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। যদি কোনো রাষ্ট্রে এ উপাদানগুলো উপস্থিত থাকে, তাহলে সেখানে সাংবিধানিকভাবে ইসলাম না থাকলেও প্রকৃতার্থে ইসলামের অনুশাসনই বিদ্যমান থাকে। আবার কোনো রাষ্ট্রে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত থাকার পরও যদি সাম্য, ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ না থাকে এবং মদ, জুয়া, সূদ, ঘুষ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা, পতিতাবৃত্তির মতো নিষিদ্ধ ও মানবতাবিরোধী কর্ম অবাধে প্রকাশ্যে-দিবালোকে চলমান থাকে তাহলে সে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকা না থাকা একই কথা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

এইডস : ইসলামই যার একমাত্র সমাধান

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

পৃথিবী জুড়ে আজ অনৈতিক এবং অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। যেকারণে বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহ পৃথিবীতে গযব নাযিল করেন। তেমনই একটি আযাবের নাম হলো ‘এইডস’। যে রোগের সমাধান এখন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি। অথচ ইসলামেই রয়েছে এর প্রকৃত সমাধান।

এই মরণব্যাধি সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে সচেতন করতে প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর ‘বিশ্ব এইডস দিবস’ পালন করা হয়। আজ আমরা জানার চেষ্টা করব ইসলামই কীভাবে এইডসকে প্রতিরোধ করতে পারে।

এইডস কী :

এইডস এর পুরো নাম হলো ‘অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম’ এবং এইচআইভি-পজিটিভকেই বলা হয় ‘এইডস’। এই রোগের ভাইরাস ‘এইচআইভি’ কারো শরীরে প্রবেশ করলে তার শরীরের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। ফলে যেকোনো সংক্রামক জীবাণু সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে অসুস্থ করে দেয়। এতে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। যা ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

এইডস কীভাবে ছড়ায় :

এইচআইভি মানবদেহের কয়েকটি নির্দিষ্ট তরল পদার্থে (রক্ত, বীর্য, বুকের দুধ ইত্যাদিতে) বেশি থাকে। ফলে, মানবদেহের এই তরল পদার্থগুলোর আদানপ্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে যে যে উপায়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে, তা হলো—

(১) এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর রক্ত সাধারণ কোনো ব্যক্তির দেহে দান করলে ঐ ব্যক্তি এইডসে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে যারা নেশাগ্রস্ত ভাসমান রক্তদাতা তারা এই পদ্ধতিতে এইডসের সংক্রমণ বৃদ্ধি করে।

(২) এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা সন্তানের মায়ের দুধ পানকালে)। মায়ের এইডস থাকলে অবশ্যই তার গর্ভের সন্তানের এইডস হওয়ার ঝুঁকি বেশি। একইসাথে আক্রান্ত মা শিশুকে দুগ্ধ পান করালেও এইডস আক্রান্ত হবে।

(৩) যেকোনো অনিরাপদ দৈহিক যৌন মিলনে। বিশেষ করে যৌনপল্লিতে যাদের নিয়মিত যাতায়াত, তাদের এইডস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একই সাথে সমকামী এবং নিম্নশ্রেণির যৌনকর্মী দ্বারাও এইডস ছড়ায়।

(৪) আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করলেও এইডস হয়। যারা নেশাগ্রস্ত তারা এই উপায়ে বেশি আক্রান্ত হয়।

(৫) আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে এইডস হতে পারে।

এইডস বৃদ্ধির কারণ :

দিনদিন দেশে বিভিন্ন কারণে এইডসের রোগী বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো—

পারিবারিক অনুশাসন না থাকা : সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কিশোর ও যুবক শ্রেণিরাই এইডস আক্রান্ত বেশি। এই কিশোর-তরুণ-যুবকরা পারিবারিক নৈতিক অনুশাসন না থাকার কারণেই নেশা এবং যৌনতায় মেতে উঠে।

ইসলামী অনুশাসন মেনে না চলা : পারিবারিক অনুশাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন খুবই জরুরী। ধর্মীয় অনুশাসনে সর্বাবস্থায় নেশা এবং অবৈধ যৌনতাকে নিষিদ্ধ করে। এই ধর্মীয় অনুশাসন না থাকার কারণে কিশোর-যুবকরা সহজেই নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ে।

সহজলভ্য পতিতাবৃত্তি : আজ শহর-গ্রাম সবখানেই পতিতাবৃত্তি হচ্ছে হাতের নাগালে। এই সহজলভ্য যৌনতার কারণে কিশোর-যুবক-তরুণরা অনায়াসেই নিষিদ্ধ যৌনাচারে জড়িত হয়। যার ফলে এইডসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

সহজলভ্য নেশাদ্রব্য : আজকাল নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে হাতের নাগালেই সকল নেশাদ্রব্য পাওয়া যায়। যা এইডস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

সামাজিক অবক্ষয় : দিনদিন সমাজ থেকে মানুষে নীতি-নৈতিকতা উঠে যাচ্ছে। ফলে আজকাল কেউ কারো মন্দ দেখলেও তাকে শুধরানোর চেষ্টা করে না। একইসাথে সমাজের মানুষ টাকা-পয়সাকে গুরুত্ব দেয়। যার ফলে উপযুক্ত বয়সের বেশি হওয়ার পরও ছেলেদের বিয়ের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে। এতে করে তরুণ-যুবকরা নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াত করে এইডসের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা : রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার কারণে দেশে আজ লক্ষ লক্ষ তরুণ বেকার। এসব শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকাররা উপযুক্ত বয়স পার হওয়ার পরও বিয়ে করতে পারে না। ফলে তারা নেশা এবং যৌনতার নিষিদ্ধ দুনিয়ায় প্রবেশ করে। এতে করেও এইডসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পায় সমাজে।

এইডস প্রতিরোধের উপায় :

এইডস এমন একটি রোগ, যার অধিকাংশ রোগীর বয়সই হচ্ছে ১৫-২৫ বৎসরের মধ্যে। অর্থাৎ আনুপাতিকহারে যুবকরাই এই

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

রোগে বেশি আক্রান্ত। তাই যুবকদের সঠিকভাবে পরিচর্যা করাই হতে পারে এইডস প্রতিরোধে সঠিক সিদ্ধান্ত।

আমরা জানি, এইডসের কোনো প্রতিকার নেই। তাই এর প্রতিরোধ জরুরী। একই সাথে এইডস বৃদ্ধির যেসব কারণ জেনেছি, তার বিচার-বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারব এইডস এমন একটি রোগ যার প্রতিরোধের শিক্ষা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। আমরা যদি ইসলামের নীতি-নৈতিকতা, আইনকানুন সঠিকভাবে পালন করি, তাহলে এইডস প্রতিরোধ অবশ্যই সম্ভব। আমরা ইসলামের বিভিন্ন অনুশাসনের মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধ করতে পারি।

পারিবারিক উপায় :

পারিবারিক সুশিক্ষা : একটি পরিবার হলো যেকোনো মানুষের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। সকল মানুষ ভালো-মন্দ সবকিছুর শিক্ষা প্রথমে পরিবারেই পেয়ে থাকে। তাই যে পরিবারে ইসলামের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা ভালো, সেই পরিবারের সন্তানেরা কখনোই অনৈতিক পথে পা বাড়ায় না। এইডসে আক্রান্তদের অধিকাংশই হলো নেশাগ্রস্ত এবং অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী। তাই প্রতিটি পরিবারে ইসলামী শাসন অনুসরণ করা হলে অবশ্যই তাদের সন্তানরা বিপথে পা বাড়াতে পারবে না।

শারীরিক উপযুক্ততায় বিয়ে করানো : এইডস প্রতিরোধে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে, সন্তানদের শারীরিক উপযুক্ততায় বিয়ে করানো। আর একমাত্র ইসলামই বলে, সঠিক বয়সে সঠিক সময়ে সন্তানদের বিয়ে দাও। আমাদের দেশে বিয়ের যোগ্যতাকে শারীরিক দিকে বিবেচনা না করে বরং অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই বিবেচনা করা হয় বেশি। অর্থাৎ ছেলেরা যখন অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত হয় তখনই তাদের বিয়ের চিন্তা করা হয়, যা কখনোই উচিত নয়। যেসব সন্তানরা উপযুক্ত সময় হওয়ার পরও বিয়ে করতে পারে না, তারা যৌনপল্লিতে যৌনকর্মীর কাছে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে। আর এভাবেই অবাধ যাতায়াতে একজনের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস বাসা বাঁধে। তাই বিয়ের বিষয়ে যদি আমাদের পরিবারগুলো ইসলামের নীতি অনুসরণ করে তাহলে এইডসের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

সামাজিক বিভিন্ন উপায় :

সৃজনশীল সংগঠন : আমাদের দেশে অতীতে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় গ্রামে অসংখ্য ধর্মীয়, সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠন ছিল। এলাকার সন্তানরা এসব সংগঠন করে তাদের কৈশোর এবং যৌবন পার করত। ফলে এলাকায় একটা সামাজিক নৈতিকতা এবং আদর্শের শৃঙ্খলা ছিল। ছোটরা বড়দের সম্মান করত। ছোটদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড়রা বাধা দিয়ে তাদের শাসন করত। যা বর্তমান সামাজিক অবস্থায় কল্পনাই করা যায় না। তাই বর্তমানেও যদি এই জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তাহলেও উঠতি বয়সের ছেলেদের আমরা অনৈতিক পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারব। আর তরুণদের এই পথ থেকে ফেরানোর মাধ্যমে আমরা এইডসসহ অন্যান্য রোগ থেকেও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব।

অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা : আমাদের দেশে আগে একটা ইসলামিক সামাজিক শৃঙ্খলা ছিল, যা এখন আর নেই। এই শৃঙ্খলার ফলে এলাকার সন্তানরা সহজে চাইলেই কখনো নেশা কিংবা অনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারত না। শুধু তাই নয়, তৎকালীন সময়ে এলাকায় কখনোই কোনো যৌন কিংবা নেশার ব্যবসার জায়গায় দেওয়া হতো না। ফলে অনেকের খারাপ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক চাপে তাদের ইচ্ছা পূরণ হতো না। যা এখন আধুনিক অনৈসলামিক যুগে সমাজে হাত বাড়ালেই বাসাবাড়িতে সহজেই পাওয়া যায়। তাই সমাজে যদি ইসলামিক পরিবেশ সৃষ্টি করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করা হয় তাহলেও এইডস প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

ধর্মীয় উপায় :

ধর্মীয় অনুশাসন : যেসব পরিবারে ইসলামের কঠোর অনুশাসন মেনে চলা হয়, সেসব পরিবারের সন্তানরা কখনোই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে না। তাই প্রত্যেকেরই উচিত সন্তানদের ইসলামের অনুশাসনে রাখা। একইসাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে এইডসের ভয়াবহতা নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমেও এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যেনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা : ইসলামে যেনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ এবং চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'আর তোমরা যেনার কাছেও যেয়ো না। কেননা এটি অত্যন্ত অশ্লীল ও মন্দ পথ' *(আল-ইসরা, ১৭/৩২)*। যদি সমাজে ইসলামের এই দাওআত সঠিকভাবে পৌঁছানো যায়, তাহলেও এইডস প্রতিরোধ সম্ভব হবে। কেননা যে নিজেকে মুসলিম দাবি করবে সে কখনোই অবাধ যৌনাচারের লিপ্ত হতে পারে না।

পর্দার বিধান চালু করা : আমাদের দেশে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগার কারণে দিনদিন ইসলামের সকল বিধান উঠে যাচ্ছে। এমন একটি বিধান হলো পর্দা। আজ রাস্তাঘাটে, শপিংমল-অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে নারী-পুরুষের পোশাকের কোনো শালীনতা নেই। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে অশালীন পোশাক পুরুষদের যৌন উত্তেজনাকে বর্ধিত করে। যার পরবর্তিত পদক্ষেপ হয় যৌনপল্লিতে যাতায়াতের মাধ্যমে। আর অসাবধানতার শেষ পরিণতি হয় এইডসের মাধ্যমে। সুতরাং ঘরে-বাইরে নারী-পুরুষদের শালীন পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং পর্দার বিধান এইডস প্রতিরোধের একটি উপায়।

সমকামিতা বন্ধ করা : ইসলামে সমকামিতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ বিশ্বে বিভিন্ন দেশ সমকামিতাকে স্বীকৃত দিয়েছে, যা অত্যন্ত গর্হিত বিষয়। এই সমকামিতার ফলেও এইডস রোগীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এখনই ইসলামের বিধান চালু করে সমকামিতা বন্ধ করা উচিত।

ওয়ায-নছীহত করা : আজ আমাদের দেশে ওয়ায-নছীহত প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অথচ ওলামায়ে কেরাম এবং দাঈরা তাদের ওয়ায-নছীহতে পর্দা, অশ্লীলতা, যেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন, যার প্রভাবে সমাজে অশ্লীলতা কমে আসে। একইসাথে আলেমরা সঠিক সময়ে বিয়ে করার ও দেওয়ার তাগিদ দেন, যার ফলে সমাজে অনাচার কমে আসে। তাই যতই ওয়ায-মাহফিলের আয়োজন করা হবে, ততই এইডসের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

রাষ্ট্রীয় উপায় :

অবাধ যৌনাচার বন্ধ করা : ইসলামে অবাধ যৌনাচার নিষিদ্ধ। এইডসের মূল টার্গেটই হলো কিশোর-তরুণ যুবকশ্রেণি। যাদের যৌন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম। তাই এইসব কিশোর-তরুণরা অবাধ যৌনতায় মেতে উঠে সহজেই। আর দেশে যৌনতা সহজলভ্য হওয়ার কারণে এইডসের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায় নিমিষেই। যদি ইসলামী আইন চালু করে অবাধ যৌনাচার বন্ধ করা যায়, তাহলে এইডস সংক্রমণ কমিয়ে আনা সম্ভব।

অবাধ মাদকদ্রব্য পরিহার করা : ইসলামে সর্বাবস্থায় মাদক হারাম। আর ইসলামী আইন না থাকার কারণে বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কারণে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা চারিদিকে। এর ফলে কিশোর-তরুণ-যুবক সহজেই নেশাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। তাই ইসলামী আইন চালু করে যদি মাদক নিষিদ্ধ করা যায়, তাহলে এইডসের ভয়াবহতা রোধ করা সম্ভব।

পতিতাবৃত্তি বন্ধ ও পুনর্বাসন : ইসলামে যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কিত সকল কিছুই হারাম। তাই আইন করে দেশে গড়ে উঠা সকল পতিতালয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বন্ধ করে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে। যদি ইসলামী আইন করে সহজলভ্য সকল পতিতাবৃত্তি বন্ধ করে তাদের পুনর্বাসন করা যায়, তাহলে এইডসের মতো ভয়ংকর রোগের বিস্তার রোধ হবে।

সকল প্রকার পর্নসাইট বন্ধ করা : ইসলাম কখনোই অশ্লীলতাকে বরদাশত করে না। অথচ আধুনিক ডিজিটাল বিশ্বে পতিতাবৃত্তি ও যৌনতা বিভিন্ন অ্যাপস এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। যদি এইডসের বৃদ্ধি রোধ করতে হয়, তাহলে ইসলামকে মেনে নিয়ে এখনই আইন করে সকল প্রকার পর্নোগ্রাফিক সাইট এবং অ্যাপস সরকারি উদ্যোগে বন্ধ করে এইডসকে প্রতিরোধ করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের সচেতন করা : সরকার ধীরে ধীরে পাঠ্যসূচি থেকে ইসলাম ধর্ম বইকে বন্ধ করে দিচ্ছে। অথচ একমাত্র ইসলামই অশ্লীলতা এবং যৌনতাকে কঠোর হস্তে দমন করে। তাই প্রতিটি শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে ইসলাম ধর্ম বইকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। একই সাথে পাঠ্যবইয়ে এইডসের বিষয়ে পাঠ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে এইডস প্রতিরোধ করতে হবে।

ব্যক্তিগত সচেতনতা :

যৌন আসক্ত ব্যক্তির বিয়ে : পৃথিবীতে অনেক পুরুষ রয়েছেন যাদের যৌন আসক্তি বেশি। এরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে এরা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যেখানে সেখানে অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়। এসব ব্যক্তির দ্বারাই এইডসের সংক্রমণ বেশি হয়। তাই যেসব পুরুষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাদের উচিত যৌনপল্লিতে না গিয়ে একাধিক বিয়ে করা। যার অনুমোদন ইসলাম দেয়। কিন্তু বর্তমান সমাজ ইসলামকে মানে না বলে একাধিক বিয়েকে সমর্থন করে না। অথচ অবাধ যৌনাচারও বন্ধ করতে পারে না। তাই ইসলামেই রয়েছে এর সমাধান। আমাদের উচিত ইসলাম মেনে বিয়ের মাধ্যমেই যৌনতার সমাধান করা।

স্ত্রীদের সতর্কতা ও উদারতা : যেসব স্বামী এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট নয়, সেসব স্ত্রীর উচিত স্বামীদের প্রতি সতর্ক হয়ে উদার হওয়া। যদি সে কলাকৌশলে স্বামীকে খারাপ পথ থেকে ফেরাতে না পারে, তাহলে তার উচিত উদার মনোভাব নিয়ে স্বামীকে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ফলে সামর্থ্যের অভাবে বিয়ে করতে না পারলে স্বামী শুধরে যাবে। নচেৎ স্বামী বিয়ে করে পাপমুক্ত থাকবে। এতে সকলেরই কল্যাণ হবে। আর বর্তমান পৃথিবীতে পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যাই বেশি। যেকারণে অসংখ্য নারী সংসার না পেয়ে পতিতাবৃত্তিতে নেমে যায়। তাই ইসলামকে মেনে চলতে পারলেই এইডসকে প্রতিরোধ করা যাবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এইডসের প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারলাম। এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, এইডস এমন একটি রোগ যার সম্পূর্ণ সমাধান ইসলামে আছে। যেকারণে ইসলামী দেশগুলোতে এইডসের ভয়াবহতা কম। সেই তুলনায় ইউরোপ-আমেরিকা-আফ্রিকায় এইডসের প্রকোপ বেশি। সুতরাং আল্লাহর গযব এইডস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা। আসুন! আমরা ইসলামকে মেনে চলি এবং সবাইকে সচেতন করি। যাতে আমরা আগামী প্রজন্মকে এইচআইভিমুক্ত একটি ধরণি উপহার দিতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ক্ষমার আদর্শে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম

*-এম. আব্দুল মজেদ মারুফ**

ক্ষমা ছোট্ট একটি শব্দ; কিন্তু এই গুণটি মহৎ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের আদর্শিক শক্তির উৎস। উদার ব্যক্তিবর্গের অন্যতম একটি গুণ হলো ক্ষমা করা। সমাজে ওই ব্যক্তিকেই মহৎ গুণের অধিকারী বলা হয়, যার মধ্যে 'ক্ষমা' করার মতো সৌজন্যবোধ আছে। আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ করার সামর্থ্য আছে কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়ে মাফ করে দেওয়াই হলো প্রকৃত অর্থে ক্ষমা। ক্ষমা না করে প্রতিশোধ নেওয়ার দ্বারা অধিকাংশ সময় ফয়সালা হয় না। কেননা প্রতিশোধের স্পৃহা আসে রাগ, হিংসা, অহংকার থেকে। মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব ধ্বংসকারী এই সমস্ত অসৎ গুণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। ক্রোধ, রাগ, দাম্ভিকতা আল্লাহর পছন্দ নয়। রাগকে যারা দমন করতে পারেন, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ 'সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল সর্বাবস্থায় যারা (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের অপরাধসমূহ যারা ক্ষমা করে দেয়; (আসলে) ভালো মানুষদের আল্লাহ (সর্বদাই) ভালোবাসেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৪)*।

উদার হৃদয়ের অধিকারী ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবসময় ভালোবাসেন। ক্ষমার আদর্শে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবার সেরা। অপরের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা এবং অন্যের অসদাচরণের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা মুমিনের অনন্য একটি গুণ। একটি নষ্ট আচরণ বা অন্যায় দূর করতে রাগ-ক্রোধ, কঠোর আচরণ, বদমেজাজ ও প্রতিশোধপরায়ণতা যতটুকু কাজে আসে, তার থেকে শতগুণ বেশি কাজে আসে ক্ষমা করার দ্বারা। তাই ক্ষমাকে একটি মহৎ গুণ বলা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই নযির স্থাপন করেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, يا معشر قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم، ابن أخ كريم، قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء 'হে কুরাইশগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে আজ কেমন ব্যবহার আশা কর? তারা বলল, সম্মানিত ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মতো। তিনি বললেন, তোমরা চলে যাও! আজ তোমরা মুক্ত'।[১]

মক্কা বিজয়ের পূর্ব ইতিহাসে যদি আমরা একটু নযর দিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাব রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় অবস্থানকরছিলেন তখন তৎকালীন কাফের-মুশরেকরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে কী ধরনের আচরণ করেছিল! কত কঠিন ও ভয়ংকর যুলুম নির্যাতন করেছে, কত অত্যাচার করেছে, তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। এ সবকিছুকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা একসময় তাকে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে যেতে বললেন। মদীনায় গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো, তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে আবার জন্মভূমি মক্কায় ফিরে এসে মক্কা বিজয় করলেন, মক্কার ক্ষমতা তার হাতে আসল। যেদিন তিনি ক্ষমতা পেলেন তার ক্ষমাশীলতার আদর্শ সেদিন মানুষের কাছে আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তারা তাকে অনেক অত্যাচার-নির্যাতন, তিরস্কার, সামাজিকভাবে বয়কট করা এমনকি হত্যার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই ধরনের ক্ষমাশীল। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এই ধরনের ক্ষমাশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾ 'হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন। সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকুন এবং মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখুন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৯৯)*।

আখেরী যামানার নবী আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম ক্ষমাশীল। ক্ষমাশীলতার আদর্শে তাঁর জীবনের বহু ঘটনা আমাদের অনুপ্রেরণা। তার মাদানী জীবনের স্বল্প পরিসরে ক্ষমার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি মক্কা বিজয়ের ঘটনায়। এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে তার ক্ষমার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তার মাক্কী জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনার প্রতি চোখ বুলিয়ে আসি। নবুঅতী জীবনের শুরুর দিকে তিনি যখন তায়েফে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। তখন পাশের খাদেম বলেছিল, আপনি তাদের জন্য বদ দু'আ করুন তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায়। জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি হুকুম দিন! তায়েফের দুপাশের পাহাড় এক করে দিয়ে তায়েফবাসীকে পিশে ধ্বংস করে দিই। কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কী বললেন? না! আমি বদ দু'আ করার জন্য প্রেরিত হয়নি। আমি রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অবলীলায় ক্ষমা করে দিলেন ওই জঘন্য মানুষগুলোকে। এ কারণেই তাকে বলা হয়েছে আদর্শের মূর্তপ্রতীক। মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাঁর মতো এমন উদার ও ক্ষমাশীল মানুষ আর ছিল না, এখনও নেই আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবেও না।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য ক্ষমার উত্তম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। আর তিনি যেহেতু আমাদের জন্য শিক্ষক, তাই তার এই শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদেরকেও হতে হবে ক্ষমাশীল। কেউ বারবার অসদাচরণ করার পরেও যদি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাহলে একসময় সে তার ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে শুধরে নেয়। ক্ষমা করার এই মানসিকতা যদি আমরা সমাজে লালন করতে পারি, তবে আমাদের সমাজ আরও সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ।

---

* আলোচক, লেখক ও সাংবাদিক।

১. তাফসীরে খাযান, ৭ম খণ্ড, ৩১৩ পৃ.।

আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

-মাযহারুল ইসলাম*

কোনো জাতিকে যদি বলা হয় তোমরা বড় হও, তোমরা জাগো, তাতে তেমন ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। জাতির ঘটে যাওয়া, রটে যাওয়া আবার কিছু না ঘটেও রটে যাওয়ার মতো বিষয়াদি স্থান পায় ইতিহাসের পাতায়। সমাজ বিনির্মাণে ইতিহাসের শিক্ষা নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এজন্য বলা হয়— যার ইতিহাসের জ্ঞান নেই সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী নয়। ইতিহাস মানুষের চেতনার বাতিঘরে আলোর মশাল জ্বালায়। বিশ্বাসের ভিতকে পাহাড়সম দৃঢ় করে। শত বাধা-বিপত্তি ঝড়-ঝঞ্ঝাও ঐ শক্ত বিশ্বাসের গায়ে চুল পরিমাণও আঁচড় দিতে পারে না। সেই বিশ্বাস বদ্ধ হয়ে আছে হৃদয়ের গহীনে। হৃদয়ের অন্দর গহীন থেকে পাহাড়সম বিশ্বাসের বন্দরে ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষার কিস্তি ভিড়ানো সময়ের যথার্থ দাবি।

ইতিহাস মানুষকে অমর করে রাখে। সভ্যতার উত্থান-পতনে মানবজাতি হারিয়ে যায় কালের গর্ভে। কিন্তু ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকে তার অনবদ্য কীর্তি। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় কখন হিংস্র বাঘের মতো হুংকার দিতে হয়, কখন সদ্য প্রসূত বাচ্চার মতো মৃদু আওয়াজ করতে হয়, কখন আলোর মশাল জ্বালাতে হয়, কখন অমানিশার ঘোর আঁধারকে দু'হাত দিয়ে সরাতে হয়, আর কখন আলোয় ভরা জোছনা রাতে জেগে থাকতে হয়। ইতিহাসই একমাত্র মানবজাতিকে সভ্য, উন্নত ও অবিস্মরণীয় করে রাখার মতো বড় আয়োজন। বিশেষত আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ইতিহাস জাতিকে উন্নত চিন্তা, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইতিহাস জাতিকে সৎ, নির্ভীক ও দূরদর্শী করে গড়ে তোলে। ইতিহাস বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরদের মুখোশ উন্মোচন করে জাতিকে অশনি সতর্কবাণীর সংকেত দেয়।

ইতিহাস হতাশা, হীনম্মন্যতা, দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করে চেতনার বাতিঘরে দীপ্ত আলোর মশাল জ্বালায়। ইতিহাস সংকটাপন্ন চরম মুহূর্তে পদযুগলকে পাহাড়সম দৃঢ় রাখার শিক্ষা দেয়। ইতিহাস কণ্টকাকীর্ণ পথের বাধা-বিপত্তির পথ মাড়িয়ে নব উদ্যমে আশার আলো দেখায়। ইতিহাস ভীতু, কাপুরুষ, হতবিহ্বল যারা অন্যায়-অবিচারের কাছে মাথা নত করে অসহনীয় নির্যাতনের জাঁতাকলে ধুঁকে ধুঁকে মরার পথ বেছে নেয়, তাদেরকে অদম্য সাহস, শক্তি, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে পিছপা না হওয়ার মতো জাতি গঠনে দুর্বার চেতনা জাগায়। ইতিহাসের কাণ্ডারীরা সর্বদা বীরের জাতি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়। ইতিহাসের কাণ্ডারীরা সর্বদা সতেজ মন, মগজ, প্রফুল্লতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে অগ্রসর হয়। জাতি তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। জাতির শিশুরা তাদেরকে মানসপটে হিরোদের কাতারে রাখে। স্বপ্ন দেখে কবে হবে সেই স্বপ্নের হিরোদের মতো। কবে বিজয়ীর ভূমিকা পালন করবে। তাই আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আজকের আয়োজন।

সুধী পাঠক! নিঃসন্দেহে পৃথিবীর উন্নত ও মহৎ জাতি হলো মুসলিম জাতি। যত জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান, তন্মধ্যে মুসলিমদের ইতিহাস, ঐতিহ্য সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল। কেবল মুসলিমদের বীরত্বগাঁথা কীতিত্ব স্বর্ণাক্ষরে সংরক্ষিত আছে ইতিহাসের পাতায়। নেই কোনো সন্দেহ, নেই কোনো সংশয়। প্রশান্ত ও দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করার মতো অবিস্মরণীয় জীবন জাগার ইতিহাস। আশ্রয় নিতে হয় না রূপকথার রাজা-রাণীর কাল্পনিক কাহিনির অংশের। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। জীবন জাগার গল্পে নৈপথ্যে অনবদ্য ভূমিকাই মূলত আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারতের মিথ্যাচার কিংবা ছোট্ট শিশুর ঘুম পাড়ানোর অদ্ভুত রকমের ঘুম পাড়ানির গল্প দেশ থেকে কোনো গল্পের মৃদু আলিঙ্গনও নিষ্প্রয়োজন মনে করে মুসলিম। মুসলিমদের সাহসী বীরের স্বপ্ন দেখানোর জন্য প্রয়োজন নেই শাহনামা ফৌরদৌসির 'সোহরাব রুস্তম'। প্রয়োজন নেই শ্রেষ্ঠ দাতার গুণার্জনের জন্য 'হাতেম ত্বাই'-এর মতো অমুসলিমদের দৃষ্টান্ত। মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতায় পাতায় হাজারো জনের দৃষ্টান্তে ভরপুর। রয়েছে শ্রেষ্ঠ বীর পাহলোয়ানের ঈমানদীপ্ত জীবন জাগার মন

* অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

ভুলানো গল্প। রয়েছে শ্রেষ্ঠ দাতার অজস্র জীবন সাজানোর প্রেরণাদায়ক গল্প। এজন্যই তো আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভুবনবিখ্যাত।

প্রত্যেক জাতিই একবার বাঁচে আর একবার মরে। কিন্তু কেবল মুসলিম জাতিই বারবার ভূপৃষ্ঠে জন্মে আর বারবার মৃত্যুবরণ করে অমর কীর্তির স্বাক্ষর রাখে। যা পৃথিবীর ইতিহাস খুব ভালো করে জানে। এই মুসলিমরাই ধুলোর তখতে বসে অর্ধ জাহান শাসন করে গৌরব অর্জন করে পৃথিবীবাসীকে অবাক করে। এই মুসলিমরাই সৈন্য সংখ্যায় খুবই নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও বিজয়ী বেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ শাসন করে।

মুসলিমদের জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় বিচরণে পৃথিবী খুবই ঈর্ষান্বিত হয়। যে মুসলিমরা যখন উজ্জ্বল বাতির আলোয় আলোকিত ছিল ঠিক তখন ইউরোপ-আমেরিকা অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। যখন মুসলিমরা শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সর্বদিক থেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে ঠিক তখন পাশ্চাত্য সমাজ ফকীরের মতো জ্ঞান অর্জনের জন্য দু'হাত পেতে থাকে মুসলিমদের দরবারে। যেই মুসলিমরা সর্বক্ষেত্রে মেধার স্বাক্ষর রেখে পরকালের অজানা গন্তব্যের বাসিন্দা হয়ে পৃথিবীবাসীকে অমূল্য সম্পদ দানে বাধিত করেছে, সেই মুসলিম জাতি আজ আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের মেজাজে জীবন সাজাচ্ছে। যেই মুসলিমরা এত কিছু করে দিয়ে গেল অথচ সেই মুসলিমরা তাদের সম্মানিত উত্তরসূরীর নাম ভুলে গিয়ে সভা, সেমিনার, লেখনী ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিউটন, আইনস্টাইন, শেক্সপিয়ার কিংবা আলেকজান্ডার, নেপোলিয়নের নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করে; দৃষ্টান্ত দিতে উৎসাহবোধ করে। আফসোস! আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এমনই মহৎ যে, বিশ্ব দরবারে সমুন্নত হয়ে থাকবে যুগের পর যুগ। যা অস্বীকার করা মোটেও সম্ভব নয়। আমাদের ইতিহাসের প্রত্যেকটি বিষয় সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। যা অন্য ধর্মের ইতিহাস এমন সুন্দর সুনিপুণ ও সুচারুরূপে পরিপাটি নেই। কেবল মুসলিমদের ইতিহাসেই এ দৃষ্টান্ত পেশ করে।

যদি আপনার মন জানতে চায়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তা জানতে পারবেন। আর যদি অন্য ধর্মের ইতিহাস জানতে চান, তাহলে দেখবেন কত কাল্পনিক ও শতধা বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের জোড়াতালি। যা আপনার সত্যানুসন্ধানী চেতনার দুয়ারকে রুদ্ধ করবে। এজন্য আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের মহত্তম শিক্ষা নেওয়া সময়ের যথার্থ দাবি। আমাদের ইতিহাসের 'মুক্বাদ্দিমা ইবনে খালদুন'-এর কাছে বিশ্ববাসী এখনো চির কৃতজ্ঞ। আছে স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করার মতো সুপার হিরো ও মহাপণ্ডিত। যারা ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা, রাষ্ট্র ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। যে সকল অনবদ্য অবদান হতে পাশ্চাত্য সমাজ চিরঋণী এবং দিবারাত্রি সে সকল অবদানে উপকৃত হচ্ছে। আফসোস! শুধু মুসলিমরাই পিছিয়ে আছে। এজন্য প্রয়োজন ইতিহাস পাঠ, বিশেষ করে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পাঠ করা- জানা, বুঝা সময়ের চাহিদায় যথার্থ দাবি উপলব্ধি করে সঠিক ভূমিকা পালন করা। তাই মুসলিমদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, স্থাপত্য, রাষ্ট্রনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, পররাষ্ট্র নীতি, অর্থনীতি, সমর বিদ্যাসহ জ্ঞানের সব শাখায় পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে অবশ্যই জাগতে হবে। সেই উজ্জ্বল বীরত্বগাথা কীর্তির গায়ে পাশ্চাত্য সমাজের মিথ্যার চাঁদোয়ায় ঢাকা সেই কলঙ্কিত চাঁদোয়া অপসারণ করে জাতিকে জানাতে হবে সত্য ইতিহাস। উদ্ভাসিত করতে হবে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বীরত্বগাথা বিজয়ের সোপান। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু মুসলিমদের বিজয়ের নিশান উড়বে। সত্যের আলোয় আলোকিত হবে পৃথিবীর প্রত্যেক পাড়া-গাঁ। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্ব মানবতাকে নতুন পথের দিশা দিবে। বিজয় হবে মুসলিমদের, বিজয় হবে বিশ্ব মানবতার।

ইলম অর্জনকারী ও প্রদানকারীর ফযীলত

-আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম*

আরবী ভাষায় 'ইলম' শব্দটি দ্বারা অনুধাবন ও উপলব্ধি করাকে বুঝানো হয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণে ইলম একটি সর্বাত্মক শব্দ যা জ্ঞান, অনুধাবন ও উপলব্ধি করাকে নির্দেশ করে থাকে। আজ আমরা জানবো জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাদানের মর্যাদা সম্পর্কে।

ইলম অর্জন :

ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব এত বেশি যে, প্রিয়নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ প্রথম অহী হলো, ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ 'পড়ুন! আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১)*। এই আয়াতটি প্রথম নাযিল হয়।[১] অর্থাৎ এখানে প্রথম কথা বলা হয়েছে— পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে। মহান প্রতিপালকের নামে পড়ার তাগিদ দেওয়ার মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিলের সূচনা। এ থেকেই জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ 'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? নিশ্চয়ই বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা জানা এবং অজানা মানুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝানো হয়েছে। জানতে হলে পড়তে হবে অর্থাৎ ইলম অর্জন করতে হবে। প্রত্যেককে ইলম অর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'।[২]

ইলম অর্জনের ফযীলত :

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।[৩] এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য কেউ যদি কোনো পথ চলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। জান্নাতের মালিক যিনি, তিনি যদি নিজেই জান্নাতের পথ সহজ করে দেন, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা থাকবে না।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত জ্ঞান অর্জন করা। তবে জ্ঞান সর্বদা আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অন্যথা সম্ভব নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।[৪] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। তিনি যদি না চান, তাহলে ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই বলে বসে থাকলে হবে না। আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ 'বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন' *(ত্ব-হা, ২০/১১৪)*। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করতে, জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সর্বদায় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, যা উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়।

কাছীর ইবনু ক্বায়স রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে আবূ দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবূ দারদা! আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর শহর মদীনা থেকে আপনার নিকট একটি হাদীছ শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তুমি কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আসোনি তো? সে বলল, না। তিনি বলেন, অন্য কোনো উদ্দেশ্যেও তুমি আসোনি? সে বলল, না। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞানান্বেষীর প্রতি তাঁদের সন্তুষ্টি হিসেবে তাদের পাখাসমূহ অবনমিত করেন। আর জ্ঞানান্বেষীর জন্য আসমান ও যমীনের অধিবাসী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মাছও (তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে)। নিশ্চয়ই আবেদের (ইবাদতকারীর) উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তারকারাজির উপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে দীনার ও দিরহাম রেখে যাননি। বরং তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। কাজেই যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে একটি বিশাল অংশ গ্রহণ করল'।[৫]

উক্ত হাদীছে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম

---

* ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর. পি. আই।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩, 'অহীর সূচনা' অধ্যায়; তাফসীর ইবনু কাছীর, ১৮/২১৪।

২. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; ইবনু মাজাহ, হা/২২৫; মিশকাত, হা/২০৪।

৪. ইবনু মাজাহ, হা/২২০, হাদীছ ছহীহ।

৫. ইবনু মাজাহ, হা/২২৩, হাদীছ ছহীহ।

করে দেন। এমনকি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আসমান এবং যমীনের অধিবাসীরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আপনি এমনিতে মানুষের কাছ থেকে দু'আ চাইলে দু'আ করবে কি-না তার ঠিক নেই। কিন্তু ইলম অর্জন করলে সকলেই আপনার জন্য দু'আ করবে। এছাড়াও বলা হয়েছে যে, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। বরং তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। সুতরাং আমাদের ইলম অর্জন করতে হবে।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ **'যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল ব্যতিত— (১) 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া, (২) এমন ইলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং (৩) এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে'।**[৬]

মৃত্যুর পরও যে আমলের ছওয়াব চলমান থাকবে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইলম। যার দ্বারা লোকের উপকার সাধিত হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, অতঃপর সেই ইলম মানুষের মাঝে বিতরণ করল বা উৎসর্গ করে দিল। যেমন একটি বই লিখল, ইলমী দারস প্রদান করল, বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করল ইত্যাদি। তার এই ইলমের ছওয়াব চলমান থাকবে। সুতরাং জ্ঞান অর্জন করতে হবে, তদনুযায়ী আমল করতে হবে এবং মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে।

জ্ঞান অর্জনে লজ্জা না করা :

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।[৭] কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে লজ্জা করা যাবে না। যেমন ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কখনও লজ্জাবোধ করলে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কোনো কিছু অজানা থাকলে তা অবশ্যই জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। লজ্জা করে বসে থাকলে চলবে না। উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লা-হু আনহা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ হক্ব কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে'। উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা (লজ্জায়) তাঁর মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! মহিলাদের স্বপ্নদোষ হয় কি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাত কল্যাণে ভরে যাক! তা না হলে সন্তান তার মায়ের মতো হয় কীভাবে?'[৮]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, জ্ঞান অর্জনে লজ্জাবোধ করা যাবে না। যদি উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা লজ্জা করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস না করতেন, তাহলে তিনি সে বিষয়ে জানতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আমরাও লজ্জা করে বসে থাকলে ইলম অর্জন করতে পারব না। সুতরাং ইলম (জ্ঞান) অর্জনের ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়।

ইলম শিক্ষাদানকারীর ফযীলত :

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে যে, (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(ফুছছিলাত, ৪১/৩৩)*। এই আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তিকে উত্তম বলেছেন, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে প্রয়োজন হয় ইলম তথা জ্ঞানের।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ 'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত' *(আন-নাহল, ১৬/১২৫)*। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হিকমত, সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে সুন্দর পন্থায় মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। এছাড়াও যদি বিতর্ক পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে সুন্দর পন্থায় বিতর্ক করতে বলা হয়েছে। কাজেই দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতা অবলম্বল করতে হবে। হিকমত অবলম্বন করে, নম্রভাষী হয়ে ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা একটি আয়াতও হয়। আর বানী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করো, এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান প্রস্তুত করে নেয়'।[৯] সুতরাং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং অন্যকে জ্ঞান অর্জনে সহযোগিতা করতে হবে। তবে অনেক সময় নিজের স্বার্থে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নামে এমন কথা আমরা বলে ফেলি, যা তিনি বলেননি। আর এরকম

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৪; ছহীহ মুসলিম, ১/১২, হা/৩৬।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/৩১৩; আহমাদ, হা/২৬৬৭৫।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১।

ঘটলে সে তার নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নিবে, যা উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়।

আবূ উমামা বর্ণনা করেছেন, নবী বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ 'যে ব্যক্তি প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সে কল্যাণ শিক্ষা করবে অথবা শিক্ষা দিবে সে পরিপূর্ণরূপে হজ্জ পালনকারীর ন্যায় ছওয়াব পাবে'।[১০] এই হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কল্যাণ শিক্ষা গ্রহণ বা প্রদানের উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে তাকে কবুল হজ্জের প্রতিদান দেওয়া হবে। অন্যত্র আছে, আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে আসবে শুধু কল্যাণ শিক্ষা করা বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মতো মর্যাদার অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আগমন করবে, সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের সম্পদের দিকে চেয়ে থাকে'।[১১] অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাপ্রদান যে কোনো একটি করলেই আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মতো মর্যাদা পাওয়া যাবে। আর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গেলে অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো অবস্থা হবে।

আবূ উমামা আল-বাহিলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল -এর নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এদের একজন ছিলেন আবেদ (ইবাদতকারী) আর অপরজন ছিলেন আলেম। তিনি বললেন, 'আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা হলো যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ব্যক্তির উপর'। অতঃপর রাসূল বলেন, 'আল্লাহ তাআলা, তার ফেরেশতাগণ, আকাশমণ্ডল ও যমীনের অধিবাসীরা এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষাকারীর জন্য ছালাত পেশ করে'।[১২] এই হাদীছে একজন ইলম প্রদানকারী ও একজন আবেদ এর মর্যাদার তারতম্য বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, একজন আলেমের মর্যাদা সবসময় উপরে। তাই আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, সে অনুযায়ী আমল করতে হবে ও প্রচার করতে হবে। কারণ একজন আলেমের জন্য ফেরেশতাসহ দুনিয়ার সকল কিছু এমনকি গর্তে থাকা পিঁপড়াও দু'আ করে। আবূ মাসঊদ আনছারী বলেন, রাসূল বলেছেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখাবে সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে, যে ঐ কল্যাণ অনুযায়ী আমল করবে'।[১৩] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো একটি ভালো আমলের কথা বলে আর সে ব্যক্তি যদি ঐ আমলটি করে তাহলে যে আমলটি করার কথা বলল, সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। তাহলে একদিকে দাওয়াতের ছওয়াব এবং অপরদিকে আমলের ছওয়াব সে ব্যক্তি পাচ্ছে।

আবূ হুরায়রা বলেন, রাসূল বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের দাওয়াত দেয়, সে ব্যক্তি ঐ ভালো আমল অনুসরণকারীদের সমপরিমাণে ছওয়াব পাবে এবং এতে তাদের (আমলকারীদের) ছওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে মানুষকে ডাকে, সে ব্যক্তি ঐ ভ্রান্ত আমল অনুসরণকারীদের সমপরিমাণে গোনাহ পাবে। আর এতে তাদের (আমলকারীদের) গোনাহ থেকে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না'।[১৪] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, সঠিক পথে দাওয়াত দিলে আমলকারীর যে ছওয়াব রয়েছে আহ্বানকারীরও অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। আর ভ্রান্ত পথে দাওয়াত দিলে ভ্রান্ত পথের আমলকারীর যেরূপ গুনাহ হয় সে পথে আহ্বানকারীরও অনুরূপ গুনাহ হয়। সুতরাং দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যা অজানা তা বলা যাবে না।

উছমান বলেন, রাসূল বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[১৫] এই হাদীছেও জ্ঞান শিক্ষা করার ও শিক্ষা প্রদান করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

আবূ আবস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন, مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ 'কোনো বান্দার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হলে, তা জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[১৬] জাবের বলেন, নবী বলেছেন, 'শহীদদের সর্দার হচ্ছেন আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে হামযা এবং ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্বৈরাচারী শাসকের কাছে যায়, অতঃপর তাকে ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। ফলে সে (স্বৈরাচারী শাসক) তাকে হত্যা করে'।[১৭] আমরা আজকাল অনেকেই দাওয়াত দিতে ভয় করি। কী জানি কী হয়! কিন্তু এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করে সে শহীদের মর্যাদা পাবে।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৭ নং পৃষ্ঠায়)

১০. ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৮৬; তাবারানী আওসাত্ব, হা/৭৪৭৩।
১১. ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৮৭।
১২. তিরমিযী, হা/২৬৮৫, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২১৩।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৭; মিশকাত, হা/২০৯।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪; মিশকাত, হা/১৫৮।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭; মিশকাত, হা/২১০৯, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৮১১; মিশকাত, হা/৩৭৯৪।
১৭. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৩০৮।

www.al-itisam.com

আল্লাহর যিকিরের ফযীলত ও ফলাফল

[২২ জুমাদাল উলা, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ খালেদ আল-মুহান্না*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ****। খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের অন্তরের খারাবি ও বদ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্টকারী নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তার ও তার পরিবারবর্গের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! যেভাবে একটি দেহ খাবার ও পানীয় ছাড়া বাঁচে না, তেমনিভাবে রূহ তার খোরাক ব্যতীত বাঁচতে পারে না; আর আত্মার খোরাক হলো তার সৃষ্টিকর্তার যিকির করা। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় 'আছ-ছহীহা'-এর মধ্যে প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আল্লাহর যিকির করে আর যে যিকির করে না, উভয়ের উদাহরণ মৃত ও জীবন্ত মানুষের মতো'।[১] অতঃপর স্বীয় রবের যিকিরকারীর জীবনই প্রকৃত জীবন। কেননা এই জীবন ব্যক্তির মৃত্যু ও দেহের বিনাশের পরও বেঁচে থাকে; যেহেতু রূহ নিঃশেষ হয়ে যায় না, বরং তা দেহ থেকে আলামে বারযাখে স্থানান্তরিত হয় মাত্র।

হে মুসলিমগণ! অন্তরের জন্য আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব চাষাবাদের জন্য পানির গুরুত্বের অনুরূপ। আল্লাহর যিকির না করলে মানুষের অন্তরও একসময় চতুষ্পদ জন্তুর জীবন ও অন্তরের মতো হয়ে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ 'আর যারা কাফের, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/১২)*।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৯।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! কখনো অন্তরে উদাসীনতা ও পাপের মরিচা পড়ে যায়; যার নিরাময় হলো আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার ও তাঁর যিকির করা। আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে বিপদাপদ দূরীভূত হয় এবং বালা-মুছীবত হালকা হয়। এর মাধ্যমে অন্তরের উজ্জ্বলতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় এবং যখন হৃদয় রোগাক্রান্ত হয় তখন এটাই তার ওষুধ।

জেনে রাখুন! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ফযীলতপূর্ণ একটি যিকির হলো, বিশ্বপ্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করা। কেননা সর্বোত্তম স্থানে ফেরেশতাগণও যিকির করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ 'আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে' *(আয-যুমার, ৩৯/৭৫)*।

এটিই ছোট বড় সকল সৃষ্টির যিকির; আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এছাড়া এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতিসহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৪৪)*।

বিপদাপদ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় বান্দার জন্য আল্লাহর যিকিরই একমাত্র অবলম্বন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'আর মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৮৭-৮৮)*। বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'যখনই কোন নবী বিপদগ্রস্ত হয়েছেন, তখনই তিনি তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন'।

তাসবীহ হচ্ছে সিজদাকারীদের শ্রেষ্ঠ যিকির। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ 'কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে' *(আস-সাজদাহ, ৩২/১৫)*। এটি অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলার

নিকটে প্রিয় যিকির এবং এর মাধ্যমেই মীযানের পাল্লা ভারী হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ 'দুটি বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, পাল্লায় অতি ভারী, আর আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তা হলো— সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ'।[২]

এটা এমন যিকির যা ফযীলতের দিকে থেকে অন্যান্য সকল যিকিরের উপর প্রণিধানযোগ্য। উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরবেলা ফজরের ছালাত আদায় করে তার নিকট থেকে বের হলেন। ঐ সময় তিনি ছালাতের স্থানে বসা ছিলেন। এরপর তিনি চাশতের পরে ফিরে আসলেন। এমতাবস্থায়ও তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলাম তুমি সে অবস্থায়ই আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তোমার নিকট হতে রওনার পর চারটি কালেমাহ তিনবার পড়েছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওযন করা হলে এ কালেমাহ চারটির ওযনই ভারী হবে। কালেমাহগুলো এই— 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি 'আদাদা খলক্বিহি ওয়া রিযা নাফসিহি ওয়াযিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালেমাতিহি'।[৩]

তাসবীহ পাঠের আরেকটি ফযীলত হলো, আল্লাহ তাআলা এটাকে জান্নাতে তাঁর প্রিয় বান্দাদের যিকির হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এটা পাঠের স্বয়ংক্রিয় সক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হবে যেমনভাবে দুনিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ﴿يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ رَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ﴾ 'জান্নাতবাসীগণ তথায় পানাহার করবে। তবে তারা সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করবে না এবং নাকও ঝাড়বে না। তাদের এই ভক্ষণকৃত খাদ্য ঢেকুরের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের শরীরের ঘাম মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত করবে। তাসবীহ ও তাহমীদের যোগ্যতা তাদের অন্তঃকরণে এভাবে দেওয়া হবে যেমনিভাবে মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে থাকে'।[৪]

জান্নাতে এর অধিবাসীরা কোনো কিছুর প্রয়োজন অনুভব করলে তারা তাসবীহর মাধ্যমে তা কামনা করবেন এবং তখনই তা পেয়ে যাবেন। তাদের অবস্থা আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করেছেন, ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ 'সেখানে তাদের ধ্বনী হবে, "সুবহানাকাল্লাহুম্মা" অর্থাৎ 'হে আপনি মহান ও পবিত্র!' এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম' *(ইউনুস, ১০/১০)*। সুফইয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তারা যখন কিছু কামনা করবে তখন বলবে, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা"। ফলে তারা তা পেয়ে যাবে'। এ জাতীয় কথা আব্দুল মালেক ইবনু জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

তাসবীহ হলো মুমিনের সকাল-সন্ধ্যার রূহের খোরাক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ 'অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও প্রভাতে' *(আর-রূম, ৩০/১৭)*।

রবের নিকট অধিক প্রতিদান লাভ ও গুনাহ মোচনের জন্য তাদের অন্যতম মাধ্যম হলো তাসবীহ পাঠ। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ছাহাবী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (বসা) ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রতিদিন ১ হাজার পুণ্য হাছিল করতে অপারগ হয়ে যাবে? তখন সেখানে বসে থাকাদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল, আমাদের কেউ কীভাবে ১ হাজার পুণ্য হাছিল করবে? তিনি বললেন, সে ১০০ তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করলে তার জন্য ১ হাজার পুণ্য লেখা হবে'।[৫] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ 'আর যে লোক দিনে ১০০ বার "সুবহানাল্লহি ওয়াবিহামদিহী"। অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর সপ্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি' পাঠ করবে, তার সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়'।[৬]

তাসবীহ হলো রবের কাছে বান্দার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম এবং তাঁর শরীআত ও নির্দেশ পালনের অন্যতম উপকরণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ 'অতঃপর তাসবীহ পাঠ করো রাতের কিছু অংশে ও দিনের প্রান্তসমূহে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার' *(ত্বো-হা, ২০/১৩০)*। এটা অন্তরে প্রশস্ততা তৈরি ও তা থেকে সংকীর্ণতা দূরীভূত হওয়ার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ 'আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। অতএব, আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান' *(আল-হিজর, ১৫/৯৭-৯৮)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তাসবীহ হলো, যেসব গুণ আল্লাহর সম্মান, পবিত্রতা ও মহত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং মুশরেকরা যেসব গুণে তাঁকে গুণান্বিত করে তা থেকে

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৪।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২৬।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৩৫।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৮।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯১।

আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা করা। ঐ ব্যক্তির অবাধ্যতার ন্যায় অবাধ্যতা হতে আল্লাহকে মুক্ত রাখা, যে মহান আল্লাহর সম্মানের পরোয়া করে না ও তাঁকে ভয়ও করে না।

তাসবীহ হলো, বান্দার পক্ষ থেকে অপারগতা ও অজ্ঞতার স্বীকারোক্তি প্রদান; রবের কাছে আনুগত্য প্রকাশ এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ ইলম ও হিকমতের স্বীকৃতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ 'আর আল্লাহ তাআলা শেখালেন আদমকে সমস্ত বস্তুসামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তুসামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোনো কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদেরকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হিকমতওয়ালা' *(আল-বাক্বারা, ২/৩১-৩২)*।

এটা কুরআনের অধিকাংশ আয়াতে 'হামদ' তথা প্রশংসার সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ 'কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন' *(আল-হিজর, ১৫/৯৮)*। তিনি আরও ইরশাদ করেন,﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ 'আর আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে' *(ক্বাফ, ৫০/৩৯)*। এজন্য কুরআনের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অধিকাংশ তাসবীহই হামদসহ ছিল।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! অধিক পরিমাণে তাসবীহ পাঠের সক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক বিশাল অনুগ্রহ ও সম্মান। তা দুটি কারণে হয়ে থাকে— (১) তাসবীহ পাঠের ফযীলত ও তার বিরাট প্রতিদান সম্পর্কে বান্দার জ্ঞাত হওয়া এবং (২) ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর মহান সৃষ্টি, পরিচালনা ও নেয়ামতরাজি সম্পর্কে বান্দার গবেষণা করা। হে মুসলিমগণ! আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, সর্বদা আমাদের রবের তাসবীহ পাঠ করা, এসব তাসবীহর অর্থ জানা, ফযীলত অনুধাবন করা ও ছওয়াবের প্রত্যাশা করা। যাতে আমাদের রূহ প্রশান্তি লাভ করে, অন্তর প্রফুল্ল হয় এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর কিতাব ও নবীর সুন্নাহর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله الذي جعل ذكره حياة للقلوب، وسببًا لتفريج الكروب، ووسيلةً لنَيْل المطلوب، وأُصلِّي وأُسلِّم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، أكثر عباد الله لربه ذكرًا، وأعلاهم عنده شرفًا وقدرًا. أما بعدُ:

বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরের মধ্যে অগণিত সুফল রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটি আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির উপায়। বিশিষ্ট ছাহাবী মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'কোনো মানুষের জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নাই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে'।[৭]

বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করার আরো সুফল হলো, যিকিরকারী বান্দার সাথে আল্লাহ থাকেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ 'কাজেই তোমরা আমার যিকির করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫২)*। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে'।[৮] সুতরাং তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, তাহমীদ ও ইস্তেগফারকারী বান্দার সাথে আল্লাহ থাকেন; তাকে হেফাযত, সাহায্য, রক্ষা ও সহযোগিতা করেন। আর যিকিরের পরিমাণের উপর ভিত্তি করেই সাহায্য-সহযোগিতা আসে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক অনুযায়ী সে প্রতিদান পেয়ে থাকে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! জুমআর দিন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আর এদিনে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি বেশি বেশি ছালাত ও সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, হে আল্লাহ! আপনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সর্দার, রাসূলগণের নেতা, মুত্তাক্বীদের ইমামের উপর দরূদ, সালাম এবং বরকত নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর পরিবারবর্গ এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শক ও আঁধার রাতের আলোকবর্তিকা তুল্য তাঁর ছাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরেকদের অপদস্থ করুন। আপনার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করুন— হে মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী আল্লাহ।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে স্মরণ করুন তিনিও আপনাদেরকে স্মরণ করবেন এবং তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন, বিনিময়ে তিনি আপনাদের নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দিবেন। আপনারা আপনাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণীকে স্মরণে রাখবেন, 'তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তোমাদের চেয়ে উঁচুস্তরের লোকদের দিকে দৃষ্টি দিয়ো না; কেননা আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা'। অতঃপর "আর আল্লাহর যিকিরই সর্বোত্তম। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত" *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*।

৭. ইবনু মাজাহ, হা/৩৭৯০।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০৫; তিরমিযী, হা/৩৬০৩।

কালিজিরা : ঔষধ নাকি নিরাময়ক?

-ওমর বিন শফিক*

কালিজিরা এক প্রকারের মসলার নাম। মসলা হলেও যেন তার মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজারো উপকারিতা। বিদ্যমান রয়েছে শতাধিক পুষ্টির উপাদান। তাহলে চলুন জেনে নেই কালিজিরা সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য। বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধানে' উল্লিখিত আছে, 'কালিজিরা/ কালিজিরা/ [বা.] বি. শীতকালে ফোটে এমন সাদা নীল পীতাভ প্রভৃতি রঙের ফুল বা তার ভেষজগুণসম্পন্ন বীরুৎশ্রেণির উদ্ভিদ যার গোলাকার ফলের কালো বীজ মসলারূপে ব্যবহৃত হয় (আনি. দক্ষিণ ইউরোপ), কালোজিরা'।[১] ইংরেজিতে যাকে নামকরণ করা হয়েছে, 'black-cumin' এবং আরবীতে যাকে বলা হয়, 'اَلْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ'।

চলুন! এবার চিকিৎসকদের নিকট থেকে অবগত হই এর উপকারিতা সম্পর্কে, ইবনে সিনা তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্বানুন ফিত তিব্ব' (Canon of medicine)-এ বলেছেন, কালিজিরা দেহের প্রাণশক্তি বাড়ায় এবং এর মধ্যে শতাধিক পুষ্টি উপাদান রয়েছে। যার মধ্যে ২১ শতাংশ প্রোটিন, ৩৮ শতাংশ শর্করা, স্নেহ পদার্থ ৩৫ শতাংশ এবং বাকি অংশ ভিটামিন ও খনিজ।

আমেরিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার Joseph Mercola যিনি 'Fat for fuel: A Revolution, The No-Grain Diet'-এর মতো কয়েকটি বিখ্যাত বইও লিখেছেন। কালিজিরা নিয়ে ৬৫০টি রিসার্চ হয় তার অধীনে। এই রিসার্চ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বলেন, কালিজিরার মধ্যে ফার্মাকোলজিকাল কমপক্ষে ২০টি উপাদান আছে। তার মধ্যে থাইমোকুইনোন (Thymoquinone) হলো এন্টি-ক্যান্সারের জন্য ব্যবহৃত উপাদান। অন্যান্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও এর প্রচুর উপকারিতা উল্লেখ করেছেন।

এখন আমরা দৃষ্টিপাত করব রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছের প্রতি-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা এই কালো বীজ (কালোজিরা) নিজেদের জন্য ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে'।[২]

আবার অনেকে এ হাদীছের অনুবাদ করেন এভাবে, 'এই কালো দানা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ'। কালিজিরার উপকারিতা সম্পর্কে হাদীছে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হল, شفاء যার অর্থ, আরোগ্য, নিরাময়, সুস্থতা। এর কোনো বহুবচন নেই। কিন্তু এর পরপরই আরেকটি شفاء রয়েছে। যার বহুবচন হচ্ছে, أشفية এর অর্থ হচ্ছে ঔষধ।[৩]

আমরা যদি شفاء এর অর্থ, নিরাময় না নিয়ে ঔষধ ব্যবহার করি তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, কালিজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তাহলে কালিজিরা কি ক্যান্সার রোগের নস্যাৎকারী? এই প্রশ্ন শোনার পর আমরা থতমত খেয়ে বলব, আসলেই তো, ব্যাপার কী? তাই চলুন شفاء শব্দের অর্থ ইংরেজিতে কী ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা দেখে আসি? এক হাদীছে এর অর্থটা Healing শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ- উপশম, নিরাময়।[৪] আরেক হাদীছে شفاء এর জায়গায় Remedy শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ, প্রতিকার, প্রতিষেধক।[৫] চলুন আমরা উপশম, নিরাময় প্রতিকার ইত্যাদি শব্দ গুলোর অর্থ সম্পর্কে অবগত হই।

উপশম : শান্তি, নিবৃত্তি, রোগের প্রশমন।[৬] **নিরাময় :** বি. রোগমুক্ত অবস্থা, সুস্থতা। বিণ. নীরোগ; সুস্থ।[৭] **প্রতিকার :** বি. দমন, সংযমন, নিবারণ।[৮]

এখন যদি شفاء এর অর্থ, উপশম, নিরাময়, প্রতিকার ধরি, তাহলে কিন্তু এটা ঔষধের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, ঔষধ এক বিষয় আর নিরাময় অন্য বিষয়। তাহলে কি আমাদের অনুবাদে সমস্যা? যদি সমস্যাই হয়, তাহলে আমরা কোনটাকে প্রাধান্য দিব? চলুন, আমরা দুটি অর্থ ব্যবহার করেই ব্যাখ্যা করি। যদি আমরা شفاء এর অর্থ Healing বা উপশম ধরি, তাহলে এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায় যে, প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে কালিজিরা সেবন করলে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং কোনো ব্যাধি আমাদের শরীরে আক্রমণ করলে অতি তাড়াতাড়ি লাঘব হবে।

এখন যদি ঔষধ হিসেবে ভাষান্তর করি, তাহলে এর সারমর্ম হচ্ছে, ধরুন কারো ক্যান্সার হয়েছে এবং সে এই মরণব্যাধি রোগের জন্য অনেক চিকিৎসা করেছে কিন্তু এই ব্যাধি কিছুতেই ভালো হলো না। তখন কেউ যদি এই কালিজিরা আল্লাহর উপর ভরসা করে ঔষধ হিসেবে নিয়মিত সেবন করে, তাহলে আল্লাহ হয়তো তাকে আরোগ্য দিতে পারেন।

উপরিউক্ত দুটি অর্থই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অতএব, আমরা যদি নিয়মিত কালিজিরা সেবনে অভ্যস্ত হই, তাহলে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ পালনের সাথে সাথে আমাদের জীবনও সুখকর হবে ইনশাআল্লাহ।

---

* অধ্যয়নরত, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট, উত্তরা, ঢাকা।

১. বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৩০৩।

২. তিরমিযী, হা/২০৪১; ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৪৮, হাদীছ ছহীহ।

৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৬০৪।

৪. English-Bangla dictionary, Bangla Academy, p. 328.

৫. English-Bangla dictionary, Bangla Academy, p. 605.

৬. বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃ. ২১২।

৭. বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৭৪৩।

৮. বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৮৫৬।

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মূলনীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*-মো. হাসিম আলী**

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার পরিচয় : 'বন্ধুত্ব' ও 'ভালোবাসা' শব্দদ্বয় আকারে ছোট্ট হলে এগুলোর উচ্চতা গগণচুম্বী, গভীরতা অতলস্পর্শী, ব্যাপ্তি বিশ্বময় এবং অনুরণন হৃদয় থেকে হৃদয়ে। 'বন্ধুত্ব' ও 'ভালোবাসা'-এর সমার্থক শব্দ হলো ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, হৃদ্যতা, সখ্যতা ইত্যাদি। শব্দদ্বয়ের আরবী প্রতিশব্দ হলো— 'বেলায়াত', 'উখুওয়াত' 'মুওয়াদ্দাত', 'খুল্লাতুন' 'মুহাব্বত' 'হুব্বুন' ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলা হয় যথাক্রমে Love ও Friendship। অভিধানে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাকে সমার্থক হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা উভয়টির উৎস স্বয়ং স্রষ্টা এবং ভিত্তি হলো বিশ্বাস।

পরিভাষায় একাধিক মানুষের গভীর সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব। অন্যকথায়, দুইজনের গভীর আত্মিক সম্পর্কের অপর নাম বন্ধুত্ব। ভালোবাসার সংজ্ঞায় বলা হয়— মনঃপূত বস্তুর প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ। অন্যকথায়, কোনো কিছুর মধ্যে কোনো যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে তার প্রতি মনের আকর্ষণকে ভালোবাসা বলে। ভালোবাসার একান্ত দাবি হলো, যাকে ভালোবাসা হয় তার মনের চাহিদা অনুযায়ী চলা।

ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের মাঝে আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা এক অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত। কারণ বন্ধুত্ব ছাড়া ভালোবাসা হয় না, আবার ভালোবাসার স্পর্শহীন বন্ধুত্বও অস্তিত্বহীন। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার উপলব্ধি একেক জনের কাছে একেক রকম হলেও ব্যাপকার্থে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা হলো— পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, অধিকার, কর্মশক্তি, অনুপ্রেরণা, নৈতিক শাসন, দায়িত্ব, আমানত। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্রষ্টার বিশেষ দান, বন্ধুত্ব চির অম্লান, দুটি হৃদয়ের টান, পারস্পরিক সম্মান, বিশ্ববিজয়ী শক্তি, বেঁচে থাকার প্রয়াস, সুখ-শান্তির উৎস। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা হলো সহজাত মানবিক গুণ, মানব অস্তিত্বের মূল ভিত্তি, জীবনের অনিবার্য অনুসঙ্গ, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, এক সুতোয় গাঁথা দুটি প্রাণ, অসম্ভবকে সম্ভব করার মন্ত্রণা, পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করা, ভক্তি-শ্রদ্ধার তীব্র বিস্ফোরণ, স্নেহের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ, মনের নিঃস্বার্থ সুন্দর অনুভূতি, আবেগকেন্দ্রিক একটি অভিজ্ঞতা, ইপ্সিতজনকে কাছে না পাওয়ার যাতনা, ত্যাগের মহিমায় নিজেকে উজ্জীবিত করা, হৃদয় কন্দরে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য সুতোর টান, সত্য ও সুন্দরের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা, নিঃসংকোচে পাশাপাশি বসা আর একসাথে চলার অনুমতি, একজনের দুঃখ-কষ্টের সংবাদে অন্যের সমদুঃখ বা কষ্টের অনুভূতি, ফুলের সুভাস আর সূর্যের কিরণ, যাকে কোনোদিন ঢেকে রাখা যায় না।

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার গুরুত্ব :

(১) সহজাত গুণ বা বৈশিষ্ট্য : জগতে জীবন মাত্রই ভালো লাগা আছে, ভালোবাসা আছে। অন্যান্য জীবে বা জড়ে স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি না থাকলেও তাদের পরস্পরের আচরণে ভালোবাসা সুস্পষ্ট। গবেষণার দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় সবকিছুর মধ্যেই ভালোবাসা নামক আকর্ষণ রয়েছে। মধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ দ্বারা আসমান-যমীনকে স্থিতিশীল রাখা হয়েছে। ভালোবাসার টানেই নদী ছুটে যায় সাগর পানে। আহ্নিক গতি হয়, জোয়ার-ভাটা হয়। পাখিরা গান গায়, ফুলেরা সৌরভ ছড়ায়। প্রজাপতি ছুটে চলে। জলপ্রপাত বয়ে যায়। ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সবকিছু চলমান, বহমান ও আবর্তিত।

(২) স্রষ্টার সেরা দান : ভালোবাসা আল্লাহর সেরা দান। তিনি যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন সে ব্যক্তির ভালোবাসা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন। মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা থেকে ভালোবাসা, দয়া, মায়ার শিক্ষা লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য থেকে মাত্র একটি রহমত তিনি জিন, মানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই হিংস্র জন্তু তার সন্তানকে মায়া করে থাকে...'।[১]

(৩) অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক : ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হলো অবিচ্ছেদ্য ও চিরন্তন। মৃত্যুর পরও এ সম্পর্ক জারি থাকে। যেমন- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিই যাকে ভালোবাসে, সে তার সাথী হবে'।[২]

(৪) বন্ধুত্বের পরকালীন প্রতিদান : হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক যে সাত শ্রেণির লোক কিয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন— সেই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়।[৩]

(৫) বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আল্লাহর নিয়ামত : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*।

---

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৫২।
২. মুসনাদে আহমাদ, হা/১২০১৩।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫৭।

(৬) বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা অমূল্য সম্পদ : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি তাদের অন্তরসমূহে পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(আল-আনফাল, ৮/৬৩)*।

(৭) আল্লাহর ভালোবাসা লাভের মাধ্যম : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে যারা মহব্বত করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে যারা উপবেশন করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে যারা খরচ করে এবং আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে যারা পরিদর্শন করে, আমার ভালোবাসা তাদের জন্য ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে গিয়েছে'।[৪]

(৮) বন্ধুত্ব হলো নিরাপত্তার গ্যারান্টি : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে' *(ইউনুস, ১০/৬২)*।

(৯) জান্নাত লাভের উপায় : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে'।[৫]

(১০) সর্বোত্তম প্রভাবক : বন্ধু হলো সর্বোত্তম প্রভাবক। এক্ষেত্রে বিখ্যাত কবি শেখ সাদী রাহিমাহুল্লাহ-এর কবিতাংশটি কতই না চমৎকার। তিনি লিখেছেন,

'সংগীর গুণ পশিয়াছে মম মাঝে গো,
নইলে কাদায় সুবাতাস কি এতো পাইতে?'

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মূলনীতি :

ইসলাম স্বভাবধর্ম। মানবতার কল্যাণে এর সকল বিধিবিধান প্রণীত। তাই স্বভাবধর্ম ইসলাম নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে।

(১) ভালোবাসার উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি : ভালোবাসা হবে শুধু আল্লাহর জন্য। এটিই ভালোবাসার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান মূলনীতি। জগতের সব ভালোবাসা আবর্তিত হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে এবং শুধু তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য; যাতে থাকবে না কোনো লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা এবং পার্থিব চাওয়া পাওয়া।

(২) ভালোবাসার ভিত্তি হলো ঈমান ও ইসলাম : ভালোবাসার ভিত্তি হলো ঈমান ও ইসলাম। সুতরাং যার মধ্যে ঈমান নেই, যে ব্যক্তি ইসলামের অনুসারী নয়, তার সাথে কখনোই অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুত্ব নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অন্যের বন্ধু। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন' *(আত-তওবা, ৯/৭১)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না' *(আলে ইমরান, ৩/২৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আল মায়েদা, ৫/৫১)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না' *(আল-মুমতাহিনা, ৬০/১৩)*।

(৩) বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার পাত্র হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ : একজন মানুষ শুধু বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক করতে পারে তাঁর মহান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারী মুমিনদের সাথে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ— যারা ছালাত ক্বায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র' *(আল মায়েদা, ৫/৫৫)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না। হোক না এই বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র' *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/২২)*।

(৪) সর্বোত্তম বন্ধু আল্লাহ তাআলা : যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু (অভিভাবক)। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান' *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৭)*। এদিকে লক্ষ্য রেখেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান-মাল দ্বারা আবূ বকর ইবনে আবূ কুহাফার চেয়ে অধিক কেউ আমার প্রতি ইহসান করেনি। আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের বন্ধুত্বই সর্বোত্তম'।[৬]

(৫) মানুষের মাঝে সর্বোত্তম ভালোবাসার পাত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র হই'।[৭]

---

৪. ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৯০।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৪।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৫৬।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪।

(৬) পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে পবিত্রতা : বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা হতে হবে নিষ্কলুষ এবং তা অবশ্যই পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হবে। কারণ হারাম ও অবৈধ কাজের ক্ষেত্রে কোনো বন্ধুত্ব বা ভালোবাসার সুযোগ নেই। তাই ভালোবাসার নামে বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, জাস্টফ্রেন্ড কালচার এবং বিবাহবহির্ভূত অথবা বিবাহপূর্ব ছেলে-মেয়েদের নষ্টামি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আল্লাহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন' *(আল-আ'রাফ, ৭/৩৩)*। অশ্লীলতার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, যা ইসলামে হারাম। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

(৭) নাম-ঠিকানা ও পরিচয় জানা : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে সে যেন তার নাম, পিতার নাম ও গোত্র বা বংশের নাম জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা তা ভালোবাসার সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য খুব বেশি কার্যকরী হয়'।[৮]

(৮) কৃত্রিমতা বর্জন : ভালোবাসার অন্যতম মূলনীতি হলো তা হবে নির্ভেজাল ও খাঁটি। তাতে কৃত্রিমতার কোনো স্থান থাকবে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিম নামধারী এবং মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের অনেকেই উপরিউক্ত মূলনীতিসমূহকে অবজ্ঞা কিংবা অস্বীকার করে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মতো ভয়ংকর ঈমানবিধ্বংসী খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের বিরাট অংশ অমুসলিম ও বিজাতীয়দের সাদৃশ অনুসরণে ব্যস্ত। তাদের বস্তাপচা সংস্কৃতি ও ক্রীড়াকৌতুকের সামগ্রীকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করছে। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো—

(ক) বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড ও জাস্টফ্রেন্ড কালচার : বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড ও জাস্টফ্রেন্ড কালচার পাশ্চাত্য থেকে আমাদানি করা বস্তাপচা সংস্কৃতি। এটি মুসলিমদের কোনো সংস্কৃতি নয়। ইসলাম বন্ধুত্বের নামে এসব নোংরামিকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না। হাদীছে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা আছে, 'কোনো পুরুষ যেনো কোনো (বেগানা) নারীর সাথে মাহরাম ব্যতীত একাকিত্বে না থাকে'।[৯]

(খ) বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অহেতুক মাতামাতি : প্রতি চার বছর পরপর বিশ্বকাপ ফুটবল ও ক্রিকেটের আসর বসে। এ বিশ্বকাপকে ঘিরে মদ, জুয়া, ব্যভিচার ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখা দেয়। কোটি কোটি দর্শক তাদের মূল্যবান সময়, সম্পদ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে বৃথা উল্লাসে মেতে ওঠে। এ উন্মাদনা শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সীর মাঝেই কম-বেশি দেখা যায়। পক্ষ-বিপক্ষ সমর্থন, হার-জিত নিয়েও তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা ও বাড়াবাড়ির শেষ নেই। এ খেলাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও ওয়ায মাহফিল ও তাফসির মাহফিল বন্ধের মতো দুঃখজনক ঘটনার সংবাদও শোনা যায়। এ খেলাকে কেন্দ্র করে বিবাহবিচ্ছেদ, স্ত্রীকে বাজি ধরা, আত্মহত্যা এমনকি হত্যাকাণ্ডের মতো গর্হিত কর্মের কথাও অহরহ শোনা যায়। অথচ এ ক্ষেত্রেও মুসলিম যুবক-যুবতি, তরুণ-তরুণী, আবালবৃদ্ধবনিতার বড় একটি অংশ ভুলে যায় বন্ধুত্ব সম্পর্কে ইসলামের সেই সুমহান নীতিমালা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে' *(আল-মায়েদা, ৫/৫৭)*।

(গ) থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন : ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের দিবাগত রাতকে থার্টিফার্স্ট নাইট বলা হয়। এটি পশ্চিমা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের একটি কালচার। তারা এদিনে আতশবাজি, পটকাবাজি, নাচ-গান, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, মাদকসেবন, নারীর শ্লীলতাহানি, যেনা-ব্যভিচারসহ নানা পাপকাজের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে। এ দিনে অবাধে ও প্রকাশ্যে চলে নারীর সতীত্ব হরণের মতো জঘন্য কাজ। এটি ইসলামিক সংস্কৃতি নয়। বরং মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একটি একটি অপসংস্কৃতি। বিশ্বব্যাপী ইসলামিক স্কলাররা 'থার্টিফার্স্ট নাইট' উদযাপনকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এক্ষেত্রে মুসলিমদের বিরাট অংশ ভুলতে বসেছে ইসলামের সেই সর্তকবার্তা— 'যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে (কিয়ামতের দিন) সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে'।[১০]

(ঘ) সেন্ট ভ্যালেন্টাইন দিবস উদযাপন : খ্রিষ্টানরা ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে' উদযাপন করে। দিবসটির উৎপত্তি খ্রিষ্টীয় ও প্রাচীন প্রথা থেকে। খ্রিষ্টানদের কাছে এটি একটি মহৎ ও পবিত্র দিন। গির্জায় গির্জায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এদিনে তারা তাদের যাজক 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'কে বিশেষভাবে স্মরণ করে। এ তারিখটি তাদের সংস্কৃতির অংশ। মধ্য ইংল্যান্ডের ডার্বিশায়ার কাউন্টির তরুণীরা এ দিনের মধ্যরাতে দলবেঁধে ৩ থেকে ১২ বার চার্চ প্রদক্ষিণ করত এবং সুর করে প্রেমগীতি আবৃত্তি করত। অর্থডক্স খ্রিষ্টানরা 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে' উদযাপন করে ৭ জুলাই। তারাও এদিনে গির্জায় আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটি পালন করে। দিবসটির অপর নাম 'ফিস্ট অব সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'।

৮. তিরমিযী, হা/২৩৯২, হাদীছ ছহীহ।

৯. শুআবুল ঈমান, হা/৫৪৪০।

১০. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাসান।

ভ্যালেন্টাইন নামের ব্যক্তিটি নিজেই রহস্যাবৃত। তাকে নিয়ে স্বয়ং খ্রিষ্টসমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এই ভ্যালেনটাইনকে নিয়ে যত কাহিনী প্রচলিত আছে সবগুলোর ভিত্তিই হলো পৌরাণিক ও খ্রিষ্টধর্মীয় উপকাহিনী। কাহিনীগুলোর মধ্যে অন্তত দুটি কাহিনী প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদের অশ্লীল যৌনপূজার ধারা বহন করে। আর একটি কাহিনী একজন পৌলিয় ধারার খ্রিষ্টধর্মপ্রচারকের মাহাত্ম্যকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ যাকে আমরা ভালোবাসা বলে থাকি, এমন কোনো ভালোবাসার ব্যাপার অন্তত এই পৌরাণিক উপকাহিনীগুলোতে নেই। যাহোক, প্রচলিত কাহিনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাহিনীটি হলো— 'সাম্রাজ্যবাদী, রক্তলোলুপ রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের দরকার ছিল এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর। একসময় তার সেনাবাহিনীতে সেনা সংকট দেখা দেয়। কিন্তু কেউ তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে রাজি ছিল না। সম্রাট লক্ষ্য করলেন, অবিবাহিত যুবকরা যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে অত্যধিক ধৈর্যশীল। ফলে তিনি যুবকদের বিবাহ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। যাতে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ না করে। তার এ ঘোষণা দেশের অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা, যুবক-যুবতীরা মেনে নিতে পারে না। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন' নামের এক ধর্মযাজকও সম্রাটের এ নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে পারেননি। প্রথমে তিনি ভালোবেসে সেন্ট মারিয়াসকে বিয়ের মাধ্যমে রাজার আদেশকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার গির্জায় গোপনে বিয়ে পড়ানোর কাজ চালাতে থাকেন। একটি রুমে বরবধূ বসিয়ে মোমবাতির স্বল্প আলোয় ভ্যালেন্টাইন ফিস ফিস করে বিয়ের মন্ত্র পড়াতেন। এই ব্যাপারটা বেশি দিন গোপন থাকেনি। বিষয়টি একসময়ে সম্রাট ক্লডিয়াস জেনে যান। ভ্যালেন্টাইন ধরা পড়ে যান এবং কারারুদ্ধ হন। কারাবাসে তিনি এক কারারক্ষীর মেয়ের প্রেমে পড়েন। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মের একটি বিকৃত নীতি ছিল যে, ধর্মযাজকরা বিয়ে বা নারীদের সাথে কোনো সম্পর্কে জড়াতে পারবে না, সেহেতু ভ্যালেন্টাইন শেষমেশ এই প্রেম অস্বীকার করেন। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি তার এই অনুরাগ দেখে সম্রাট তাকে একটি লোভ দেখান। তিনি প্রস্তাব দেন, তিনি ভ্যালেন্টাইনকে ক্ষমা করবেন এবং নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দেবেন এই শর্তে যে, তাকে খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করতে হবে। ভ্যালেন্টাইন অস্বীকৃতি জানালে তাকে ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একসময় গ্রিস খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করল। পৌত্তলিক বসন্ত উৎসবের নতুন নাম হলো 'ভ্যালেন্টাইন ডে'। সাধু ভ্যালেন্টাইনের নতুন নতুন মহিমা শোনা যেতে লাগল যে, তিনি প্রেমের শহীদ, ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি'।

প্রকৃতপক্ষে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে **'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস'** নামে কোনো দিবস নেই। আমরা হুজুগে মাতালরা বেকুবের মতো 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে'কে 'বিশ্বভালোবাসা দিবস' হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছি। এ দিবসটিতে ভালোবাসার নামে 'মন্দবাসা'ও কম হয় না। তরুণ-তরুণীদের পরস্পরকে আহ্লাদিত করতে নির্দ্বিধায় চলে চুমোচুমি আর দেহপ্রদর্শনের নাটক। হাজার হাজার যুবক-যুবতী এ দিনে তার সতীত্ব ও চরিত্রকে বিসর্জন দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফেরে। তাই অনেকে এ দিবসটিকে উল্লেখ করে থাকেন 'বিশ্ব বেহায়া দিবস', বিশ্ব নগ্নতা দিবস', 'বিশ্ব লুচ্চামি দিবস' হিসেবে।

আবার, ঈমান ও ইসলামের অনুসরণ ও অনুকরণের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তিদের মধ্যেও ভালোবাসা নিয়ে মাতামাতি, বাড়াবাড়ির কমতি নেই। তাদের অনেকেই ভালোবাসাকে দল, মতবাদ, মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। তাদের অনেককেই বিভিন্ন ঠুনকো অজুহাতে কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের কারণে অথবা ফিক্বহী মাসআলার কারণে বা দলীয় ভিন্নতার কারণে মুমিনদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা-বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সামান্য কারণে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পরস্পরে শত্রুতে পরিণত হয়। অনেক সময় মুসলিম ভাইয়ের পরিবর্তে কোনো অমুসলিম বা শিরক ও বিদআতী আক্বীদাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত লোককেও সাহায্য করে।

একজন ভালো বন্ধু হলেন রক্ষাকারী ছায়ার মতো। যে তা খুঁজে পেল সে যেনো একটি গুপ্তধন পেল। সুতরাং বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ঈমান, ইসলাম, দ্বীনদারিতা, সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অনুসরণ, উদারতা, ন্যায়বোধ, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, সৎকর্মশীলতা, আমানতদারিতা, চারিত্রিক সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, রুচিশীলতা, আদর্শিক দৃঢ়তা, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা, সততা, আখেরাতের কল্যাণ, স্থিরচিত্ততা, ধৈর্যশীলতা, ক্ষমাশীলতা, দৃঢ়তা, তাওয়াক্কুল, ওয়াদা পালন, আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়াসহ যাবতীয় নৈতিক উপযুক্ততার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, যার তাগিদ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে উল্লেখ হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে এমন সব লোকদের সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে, যাদের সংশ্রব ও বন্ধুত্ব পরকালে আফসোসের কারণ হতে পারে। যেমন জাহান্নামীদের ভাষা উল্লেখ হয়েছে, 'হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৮)*।

আল্লাহ তাআলা আমাদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাকে পরকালে নাজাতের অসীলা বানিয়ে দিন এবং প্রকৃত ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে স্রষ্টা, স্বজন, স্বদেশ, সংসার, সন্তান, স্বামী, স্ত্রীসহ সকল সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

কিছু হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ

*-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান**

মুয়াযযিনের আযানের ধ্বনি কানে ভেসে আসছে, এই তো বলছে 'আছ-ছলাতু খয়রুম মিনান নাউম' অর্থাৎ ঘুম থেকে ছালাত উত্তম। ঘুম থেকে উঠে সুন্দরভাবে ওযূ করে দুই রাকআত ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর বাসা থেকে ফজরের ছালাতের জন্য মসজিদে রওয়ানা দিলাম। মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছালাত আদায় করলাম। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছালাত সম্পর্কে অনেকেই জানেন না যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ছালাত। হাদীছে এসেছে, আবূ ক্বাতাদা সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে নেয়'।[১]

যাহোক তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছালাত আদায় করে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম, তারপর ইমাম সাহেব এসে ফজরের ছালাত শুরু করলেন। মসজিদের সকল মুছল্লী জামাআতবদ্ধ হয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম।

ফজরের ছালাতের পর আমি কিছুক্ষণ যিকির-আযকার করলাম। অতঃপর দেখা যাচ্ছে একে একে সবাই যার যার বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিচ্ছে। মসজিদ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আমিও ভাবলাম বাসায় চলে যাই, কেন জানি আজ একটু বেশি ঘুম পাচ্ছে। যখনই মসজিদ থেকে উঠে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিব, ঠিক তখনই আমাদের মহল্লার দ্বীনী বড় ভাই আহমাদ মসজিদের এক কোণায় বসে ছিলেন, তিনি আমাকে ডাকলেন। প্রায় সময় দেখা যায় ফজরের সময় আমরা সবাই চলে গেলেও তিনি মসজিদে বসে থাকেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলছেন, জাহিদ! এই জাহিদ!

—জি ভাই! আস-সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন?

—ওয়ালাইকুম আস-সালাম! এইতো আল-হামদুলিল্লাহ ভালো। তোমার কী অবস্থা? ইদানীং দেখা যাচ্ছে ফজরের সময় তোমার খুব তাড়া?!

—ইয়ে মানে, আসলে ভাই ইদানীং রাতে একটু দেরি করে ঘুমাই তো, সেজন্য ফজরের সময় চোখে প্রচণ্ড ঘুম থাকে। তাই বাসায় গিয়ে একটু ঘুমাই।

—ও তাহলে এই ব্যাপার। কিন্তু জাহিদ তুমি কি জানো আজ আমাদের মাঝে একটি সুন্নাহ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে? যা অধিকাংশ মানুষেরই অজানা।

—কী সেই সুন্নাহ ভাই, যা আমিও জানি না?

—এই যে ফজরের ছালাতের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা। এটি একটি বিলুপ্ত সুন্নাহ। কেননা আমাদের রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় সূর্য না উঠা পর্যন্ত তার জায়গা ছেড়ে উঠতেন না।

—কী বলেন ভাই? তার মানে আপনাকে এ কারণেই মাঝে মাঝে দেখি ফজরের সময় মসজিদে বসে থাকতে। কিন্তু ভাই কী করব রাতে যে দেরি করে ঘুমাই।

—এটিও আজ একটি বিলুপ্ত সুন্নাহ, রাতে আগে আগেই ঘুমিয়ে যাওয়া। হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।[২] অথচ দেখো, আজ আমাদের জীবনটা হয়ে গেছে পুরো উল্টো। যার কারণে দেখা যায় আমরা প্রায়ই সময়মতো ফজরের ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে পারি না।

তুমি জেনে আরও অবাক হবে যে, আমরা যারা ফজরের পর ঘুমাই, তারা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। আর তা হচ্ছে- আল্লাহ তাআলা তার বান্দার উপর বরকত নাযিল করেন। হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি, সাখর আল-গামিদী রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের কাজে বরকত দান করুন'।[৩]

অথচ আমরা এই সময়টা ঘুমিয়ে পার করে দেই। এমনকি আজ বিজ্ঞানও বলছে, যারা রাতে দেরি করে ঘুমায় আর সকালে দেরি করে উঠে, তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অথচ দেখো আজ থেকে সেই চৌদ্দশ বছর আগেই আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া সুন্নাহ বলছে, তাড়াতাড়ি ঘুমাতে এবং তাড়াতাড়ি সকালে উঠতে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। যার কারণে আজ আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে রাখছি।

---

* এইচ.এস.সি ফলপ্রার্থী, সরকারি মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৯।

৩. আবূ দাঊদ, হা/২৬০৬, হাদীছ ছহীহ।

আহমাদ ভাই যখন কথাগুলো বলছিল, তখন কেন জানি কথাগুলো নিজের হৃদয়ে গিয়ে খুব করে নাড়া দিচ্ছিল। আসলেই আজ আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে দাবি করছি অথচ তার সুন্নাহর ব্যাপারে আমরা খুবই বেখেয়াল। অতঃপর আবার আহমাদ ভাই বলল, —দেখো জাহিদ! আসলে আমি তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কথাগুলো বলছি না। আমার নিজেরই খুব কষ্ট লাগে যখন দেখি আমরা নিজেরাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি অথচ আমরা নিজেদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে দাবি করছি।

—নাহ ভাইজান, আসলেই কথাগুলো আজ আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমিও ভাবছিলাম, আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে দাবি করছি অথচ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর ব্যাপারে উদাসীন। যাহোক ভাইজান, আমি আজ থেকে চেষ্টা করব সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ পাবন্দী করার, ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব এখন থেকে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর এবং ফজরের সময় সূর্য না উঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকার।

—যাক আল-হামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো লাগল। আমরা যদি একে একে এভাবে হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহর গুরুত্ব বুঝি, তাহলে একদিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর আমরা সূর্য উঠা পর্যন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আর আমি আহমাদ ভাইয়ের কথাগুলো নিয়ে ভাবছিলাম। নীরবতা ভেঙে আবারও আহমাদ ভাই বললেন, —আচ্ছা জাহিদ! আমার মনে হয়, তুমি আমার কথাগুলো শুনে কষ্ট পেয়েছ?

—কী যে বলেন ভাই! বরং কথাগুলো আরও আমার জন্য অনেক প্রয়োজন ছিল।

—আচ্ছা জাহিদ! তুমি কি জানো ফজরের সময় সূর্য উঠার পর একটা বিশেষ আমল আছে? যা শুনলে হয়তো তুমি খুশি হয়ে যাবে।

—আসলেই? কোন আমল ভাই? বলুন তো একটু।

—আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকির করবে। এরপর দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও উমরা পালনের ছওয়াব হবে'।[৪] দেখেছ, আমরা মক্কায় না গিয়েও এখান থেকে হজ্জ ও উমরা পালনের ছওয়াব পেতে পারি মাত্র দুই রাকআত ছালাত আদায় করলে।

—সুবহানাল্লাহ! ভাইজান কী শোনালেন আমাকে! আমার মন তো ভরে গেল। আহ! কত বড় একটা ফযীলত মাত্র দুই রাকআত ছালাত আদায় করলেই।

তারপর আমি আর আহমাদ ভাই দুই রাকআত ছালাত আদায় করলাম। আজকের ফজরটা কেন জানি আগেকার তুলনায় খুবই ভালো লাগলো। মসজিদের ভেতরটা সূর্যের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। অবশেষে আমরা মসজিদ থেকে বাইরে বের হলাম। আজ বাইরে কিছুটা ঠাণ্ডা অনুভব করছি, এই মুহূর্তে যদি এক কাপ চা পান করা যেত, তাহলে আজকের সকালটা পরিপূর্ণ হতো। যেমন ভাবা তেমন কাজ, আহমাদ ভাই বললেন, —জাহিদ! চলো চা পান করি।

অবশেষে আমরা একটি চায়ের দোকানে পৌঁছলাম। দোকানি মামা আমাদেরকে চা পরিবেশন করলেন। আমরা চা পান করছি এরই মাঝে আহমাদ ভাই আমাকে বললেন, —জাহিদ একটা জিনিস কি তুমি খেয়াল করেছ?

—কোন্ জিনিস ভাই?

—এই যে আমরা চায়ের দোকানে এসে চা পান করছি, একটু পরেই দোকানি মামাকে টাকা দিব। জিনিসটা খেয়াল করো সে কিন্তু তার রিযিক্বটা আমাদের মাধ্যমে সকাল সকাল পাচ্ছে। আর আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে তার দোকানে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল, আমাদের উপর রহমত নাযিল হচ্ছে আর তার উপর রিযিক্ব, তাই না?

—এরকম তো কখনো ভেবে দেখিনি, ভাইজান! না ভাই আর সকাল বেলা ঘুমানো যাবে না। আল্লাহ তাআলার রহমতপ্রাপ্ত হতে হবে আমাদের।

—তাই বলে আবার সকাল সকাল এসে মামার সব চা একাই পান করে ফেল না কিন্তু, অন্যদেরকেও রহমতপ্রাপ্ত হতে দিয়ো।

—কী যে বলেন না ভাই আপনি।

অবশেষে আমরা চা পান করে যে যার মতো বাসায় চলে গেলাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহগুলো পালন করার তাওফীক্ব দান করুক- আমীন!

৪. তিরমিযী, হা/৫৮৬, হাসান।

গ্রন্থ পরিচিতি-১৪ : সুনানে নাসাঈ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা: ইলমে হাদীছে যাদের খেদমত অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, যঈফ হাদীছ থেকে ছহীহ হাদীছকে পৃথককরণে যাদের অবদান অসামান্য, যাদের নাম ব্যতীত ইসলামের ইতিহাস কখনোই পূর্ণ হওয়ার নয়, তাদের মধ্য অন্যতম হলেন ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ। তার রচিত কালজয়ী গ্রন্থ সুনানে নাসাঈ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থের নাম: 'সুনানুন নাসাঈ'। এর অপর নাম 'নাসাঈ আল মুজতাবা'। অনেকেই এ মর্মে মতানৈক্য করেছেন যে, মুজতাবা তথা সুনানে নাসাঈ গ্রন্থটি ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ রচনা করেননি। বরং তার ছাত্র ইবনুস সুন্নী এটি সংকলন করেছেন মাত্র। তবে জমহূর আলেম বলেছেন যে, সুনানে নাসাঈ তথা মুজতাবা গ্রন্থটি ইমাম নাসাঈ স্বীয় বৃহদায়তন গ্রন্থ 'আস-সুনানুল কুবরা' হতে সংক্ষেপ করে স্বহস্তে রচনা করেছেন। আর এটাই সঠিক মত।[১]

বৈশিষ্ট্যসমূহ: এই গ্রন্থটির অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

(১) এটি কুতুবে সিত্তাহ তথা ছয়টি অধিক বিশুদ্ধতম গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[২] (২) এর অধিকাংশ হাদীছ ছহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে পাওয়া যায়। (৩) এ গ্রন্থের হাদীছগুলোর অধিকাংশই ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ। (৪) অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখিত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে থাকা গোপন ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (৫) এ গ্রন্থে অনেক স্থানেই হাদীছের মতনের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। (৬) একই অনুচ্ছেদের মধ্যে একই হাদীছকে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হওয়া হাদীছগুলোর মধ্যে শাব্দিক তারতম্য থাকে কিংবা রাবীর হাদীছ শ্রবণের উল্লেখ থাকে ইত্যাদি বিভিন্নরকম অতিরিক্ত ফায়েদা থাকে। (৭) একই হাদীছ কখনো তিনি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট মাসআলার সাথে হাদীছের মতন যতটুকু সম্পৃক্ত ততটুকু বর্ণনা করেছেন। আবার অন্যত্র একই হাদীছ দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন। (৮) আবার কখনো কখনো তিনি মতনকে বাদ দিয়ে কেবল সনদ বর্ণনা করেছেন। (৯) মাঝে মাঝে তিনি হাদীছের মধ্যে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যাও করেছেন হাদীছের শেষে। তবে এটা খুব কম হাদীছের মধ্যেই দেখা যায়। (১০) ইমাম নাসাঈ হাদীছ বর্ণনায় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের হাদীছ বর্ণনার রীতি অনুসরণ করেছেন। (১১) এ গ্রন্থে মোট ৫২টি কিতাব বা অধ্যায়, ২৫৭২টি অনুচ্ছেদ এবং মোট ৫৭৫৪টি হাদীছ রয়েছে।

ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ: সুনানে নাসাঈর ব্যাখ্যাগ্রন্থ যারা রচনা করেছেন তাদের নামসমূহ হলো—

(১) ইমাম সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম হলো 'যাহরুর রুব্বা আলাল মুজতাবা'। (২) আল্লামা শায়েখ আবুল হাসান সিন্দী রাহিমাহুল্লাহ সুনানে নাসাঈর টীকা রচনা করেছেন, যা 'হাশিয়াতুস সিন্দী আলা সুনানে নাসাঈ' নামে প্রসিদ্ধ। (৩) আল্লামা শায়েখ মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আত-তালীকাতুস সালাফিয়্যা'। সুনানে নাসাঈর উপর ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন সদ্য প্রয়াত মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনে আদম আল ইথিওপী। ২০ সেপ্টেম্বর-২০২০ ইং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম 'যাখীরাতুল উক্বা ফী শারহিল মুজতাবা'। এছাড়াও আরও বেশ কিছু ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ: এই মহান গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন ইমাম হাফেয আহমাদ ইবনু শুআঈব ইবনু আলী ইবনু সিনান ইবনু বাহর ইবনু দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ আবূ আব্দুর রহমান আল-কাযী।[৩] খুরাসানের একটি শহর 'নাসা'। সেই দিকে সম্বন্ধ করে তাকে নাসাঈ বলা হয়। তিনি ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।[৪] অল্প বয়সে তিনি হাদীছের জ্ঞান চর্চা শুরু করেন এবং কুরআনের হাফেয হয়েছিলেন। তিনি খোরাসান, হিজায, মিছর, ইরাক, শাম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইলমী মারকাযসমূহে সফর করে ইলম হাছিল করেছেন। ইলম অর্জনের লক্ষ্যে তার মতো এত সফর করার নযীর পাওয়া যায় না।[৫]

---

১. সুনানে নাসাঈ, 'ভূমিকা' পৃ. ৬১, মুওয়াসসাতুর রিসালাহ।
২. হুসনুল মুহাযারাহ, পৃ. ৩৫০; আল-হিত্তা, পৃ. ৩৯৬।
৩. খলীলী, আল-ইরশাদ, ১/৪৩৫।
৪. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৯৮।
৫. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪/১২৭।

শিক্ষকগণ: তার অনেক উস্তায রয়েছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী, যুহলী, আলী ইবনু খাশরাম, আলী ইবনু হুজর, আব্বাস ইবনু আব্দুল আযীম আম্বারী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ।[৬] তবে তিনি ইমাম বুখারী হতে হাদীছ শ্রবণ করেছেন কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

ছাত্রগণ: তার অসংখ্য ছাত্রের মধ্য হতে ইবরাহীম ইবনু ইসহাক্ব, আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম, আবুল আব্বাস আবইয়ায, আহমাদ ইবনু ইবরাহীম রাহিমাহুমুল্লাহ উল্লেখযোগ্য।[৭]

তার সম্পর্কে ইমামদের প্রশংসা: ইমামগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হাফেয যাহাবী তাকে হাদীছের ই'লালের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দক্ষ ইমাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮]

৬. তাহযীবুল কামাল, ১/৩২৯; তাহযীবুত তাহযীব, ১/৩৫।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪/৩২।

ইমাম হাফেয ইবনু নুকতা বলেছেন, 'ইমাম নাসাঈ মুসলিম জাহানের ইমামদের ইমাম ছিলেন'।[৯]

গ্রন্থসমূহ: তিনি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন: আস-সুনানুল কুবরা, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ফাযায়েলুল কুরআন, খাছায়েছু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইত্যাদি। এ যাবৎ তার লিখিত ৩২টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

মৃত্যু: অত্যন্ত নম্র, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মুজতাহিদ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম, হাদীছ বিশারদ এই মহান ব্যক্তি ফিলিস্তীনে ৩০২ হিজরীতে মারা যান।[১০]

উপসংহার: সুনানে নাসাঈ ছয়খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। হাদীছ থেকে মাসআলা ইসতিমবাত করা শেখার ক্ষেত্রে ছাত্র, আলেম ও গবেষকদের জন্য এই গ্রন্থটি হতে পারে উত্তম সহায়ক। আল্লাহ আমাদেরকে এ গ্রন্থের মধ্যে থাকা মনি-মুক্তা আহরণ করার তওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৯. ইবনু নুকতা, তাকমিলাতুল ইকমাল, রাবী নং ৬৩২৬।

১০. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১/৩৪০।

'ইলম অর্জনকারী ও প্রদানকারীর ফযীলত'-প্রবন্ধটির বাকী অংশ

আর সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করার জন্য আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন। কারণ যারা সৎকর্ম করবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে চাইবে না' *(আল-কাহফ, ১৮/১০৭-১০৮)*। এই আয়াতে বলা হয়েছে যারা ভালো কাজ করে তাদের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস, যা তাদের জন্য প্রস্তুত করা আছে। জান্নাতের যে কয়েকটি স্তর রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস। যার অবস্থান আল্লাহর আরশে আযীমের নিচে।

সুধী পাঠক! এতক্ষণ যে ফযীলত সম্পর্কে আমরা জানলাম, সেগুলোকে ঠেকিয়ে দিবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী। তিনি বলেন, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 'আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; মিশকাত, হা/২০৪)।

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আমল সম্পর্কে যে ফযীলত আমরা জানলাম সেই আমল করলে যে ছওয়াব আমাদের পাওয়ার কথা তা আমরা পাব না, যদি আমাদের অন্যান্য ফরয ইবাদত না থাকে। ফরয আমাদের আদায় করতেই হবে। ফরয হচ্ছে বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক, যা করতেই হবে। তাই সময় থাকতে আমাদের পরকালের ভাবনা ভেবে ইবাদত করতে হবে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ একটি প্রবাদ আছে 'Safety first, work last' অর্থাৎ নিরাপত্তা আগে, কাজ পরে। যাবতীয় ইবাদতকে সুরক্ষিত রাখতে চাইলে আগে ছালাত আদায় করতে হবে। ছালাত হচ্ছে সকল ইবাদতের নিরাপত্তা প্রহরী। তাই আমাদের সময় থাকতে সজাগ হতে হবে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হবে। দ্বীনের সকল ফরয সঠিকভাবে প্রতিপালনের সাথে সাথে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞান সঠিক কাজে ব্যয় করতে হবে; তাহলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

ইশ! যদি করতাম!

-সাব্বির আহমাদ*

‘বাবা, ও বাবা’ বলে ডাকতে ডাকতে পাশের রুম থেকে আসলো যাকিয়া। সারাদিন ব্যস্ততার অবসরে তখন বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর সাথে গল্প করছিল আরিফ। ‘জানো বাবা, রাঈসারা আজ বিমানে করে কক্সবাজার যাচ্ছে। ওরা সমুদ্রসৈকতে গোসল করবে, সাঁতার কাটবে আরও কত্ত মজা করবে। আমারও বিমানে চড়তে ইচ্ছে করছে। আমাকেও নিয়ে চলো না, বাবা’। আবদারের সুরে বললো যাকিয়া। মেয়ের কথার প্রত্যুত্তরে আরিফ বললো, ‘আচ্ছা মা, পরের সপ্তাহে না হয় আমরাও কক্সবাজারে ঘুরতে যাবো। রাতে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে প্রাণভরে ঢেউয়ের শোঁ শোঁ শব্দ শুনবো। সমুদ্রের নিরন্তন বয়ে চলা, ঊর্মির উথালপাতাল গর্জন, দিগন্তবিস্তৃত তার জলরাশি আমাদের মুগ্ধ করে তুলবে’। বাবার কথাগুলো শোনামাত্রই আহ্লাদে নেচে উঠলো যাকিয়া।

রাজশাহী কাটাখালীর এক সরকারি অফিসে কাজ করেন আরিফ। অফিসের অদূরেই দু’কামরার এক ছোট্ট বাড়িতে থাকেন তিনি। সাথে তার স্ত্রী এবং ১০ বছরের তনয়া যাকিয়াও থাকে। যাকিয়া পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। আরিফ খুবই এক্টিভ। নিয়মিত অফিসে যান তিনি। তার প্রাত্যহিক এ্যাসাইনমেন্ট রোজ কমপ্লিট করেন। তজ্জন্যই অফিসার মিজানুর রহমানের সবচেয়ে প্রিয় মুখাবয়ব আরিফ। তার সাথে মিত্রসুলভ আচরণ করেন মিজান স্যার।

মসজিদের মিনার ভেদ করে আযানের ধ্বনি এসে শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করলো। রাত গড়িয়ে নূতন ভোরের উদয় হলো। ঘুম ভাঙলো আরিফের। ওযূ করে ফজরের ছালাত পড়ে নিত্যদিনের ন্যায় আজও কুরআন হাতে নিলেন। তার চোখে-মুখে এখনো ঘুমের ছাপ পরিস্ফুট। আজ তো রবিবার। শনি আর রবিবারে তাদের অফিসের দুয়ার বন্ধ থাকে। তবে আরিফ আর তার দু’জন কলিগ আছেন, শুধু তাদের কোনো একজনকে সেদিনগুলোতেও ডিউটি করতে হয়। আর আজ আরিফের ডিউটি। আরিফ ভাবলেন, ‘প্রত্যহই তো অফিসে যাই। আজ না হয় নাই-ই গেলাম। আজ তো আবার কেউ আসবেও না’। ফলে তিনি আবারো ঘুমের আয়োজন করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তন্দ্রা এসে তার আঁখিদ্বয় ছুয়ে দিলো।

আজ সোমবার। কাল তারা কক্সবাজারে যাবে। তাই আজ অফিসের চৌকাঠে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে পা দিলে তাকে একটি কাগজ এবং কিছু কথার ফুলঝুরি নিক্ষেপ করেন মিজান স্যার। সেই কাগজ খুলে তিনি তার চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিলেন না। এতে যে তার বহুদিনের মেহনত ভূলুণ্ঠিত করার উপাদান রয়েছে। হৃদয়কোণে পুঞ্জীভূত স্বপ্নগুলো মুছে দেওয়ার এক মারাত্মক উপকরণ। ‘আসলে আরিফ ভাই, গতকাল কাউকে না জানিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল অফিস থেকে স্যার এসেছিলেন। অফিস তালাবদ্ধ দেখে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। আধ ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর মিজান স্যারকে ফোন দিয়ে অপ্রসন্ন গলায় দু-চার কথা শুনিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে গিয়েছেন। আর তিনিই আপনাকে অফিস থেকে কর্মচ্যুত করেছেন’। পার্শ্ব থেকে একজন বাক্যগুলো পাঠ করল। কথাগুলো শোনামাত্রই আরিফের শিরে যেন আকাশ হুড়মুড় খেয়ে পড়লো। আজ যে তাকে দৈন্যের দায়ে পথে বসতে হবে। দুনিয়াটা আজ বিস্বাদ লাগছে। মনের উঠোনে দুঃখের ঝটিকা যেন দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায় ধেয়ে আসছে। পুলকেরা নিবিড় তিমিরে হারিয়ে যাচ্ছে। মনোরথগুলো অতল সিন্ধুর হিল্লোলে উথালপাতাল করছে।

ঘড়ির কাটা তখন ৬টা ছুঁইছুঁই। নীলিমায় মেঘেরা মেলা বসিয়েছে। পাখিরা খেলা করছে। মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত স্বপ্নগুলো যেন নদীর স্রোতের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। রক্তিম গোধূলিলগ্নে পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে একরাশ দুঃখ নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে নদীর পানে চেয়ে আছেন আরিফ। হয়তো তিনি তার আদরের রাজকন্যা যাকিয়ার বিমানে করে কক্সবাজার যাওয়ার ছোট্ট অভিপ্রায়টুকু পূরণ করতে পারবেন না। তাকে প্রাণভরে সমুদ্রের সেই মনোহর দৃশ্য দেখাতে তিনি ভীষণভাবে অক্ষম।

প্রিয় পাঠক! বিপদ অজ্ঞেয় এক বিস্ফোরণের নাম। যা আমাদের ঠুনকো এ জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে লুকিয়ে আছে। আমরা মাঝে মাঝে ভেবে বসি, ‘প্রতিদিনই তো পড়া করে যাই। আজ না হয় থাক। শনিবার থেকে ভালোভাবে পড়া শুরু করব’। আবার কখনো ভাবি, ‘আজ বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা দেই। কাল ফজর থেকেই না হয় ছালাত শুরু করব’। কিন্তু ফজর উদয় হওয়ার আগেই যদি চলে আসে মৃত্যু-চিঠি। তাহলে কেমন হবে? যখন পড়া না করে যাওয়ার দিনই শিক্ষক পড়া জিজ্ঞেস করেন, তখন মনে হয়, ইশ! যদি পড়তাম! আজ যদি আরিফ ভেবে কাজ করতেন, যদি তিনি অফিসে যেতেন, তাহলে কি তাকে এ দিনটির মুখোমুখি হতে হতো, বলুন? অতএব, সাবধান!

* অধ্যয়নরত, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।

অতিথি পাখি

-জিশান মাহমুদ
শ্রীবরদী, শেরপুর

হাজার মাইল দূরে থেকে
ডানায় ভেসে ভেসে,
অভয় আশ্রম খুঁজে আসে
আমার বাংলাদেশে।
হাওড় বাওড় জলাশয়ে
আবাস ভূমি গড়ে,
নানান রকম পাখি এসে
হৃদয় হরণ করে।
সারস, খঞ্জন, হুদহুদ আর
হট্টিটি বাজ মিলে,
আনন্দেরই পসরা সাজায়
খালে বিলে ঝিলে।

পড়ালেখা

-গোলাম আযম
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

মাগো আমার পড়ালেখার
খাতা কলম কই?
খানিক পরে পড়তে বসবো
সাজিয়ে রাখো বই।
বাংলা গণিত ইংরেজিটা
পড়ছি কিনা রোজ,
শত কাজের ভিড়ে মাগো
রাখো তুমি খোঁজ!
রোজ বিহানে পাঠশালাতে
স্যারে ধরেন পড়া,
পড়ালেখা দিয়ে মাগো
যায় যে জীবন গড়া।

শীতের পিঠা

-শফিক নোমানী
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

শীতের দিনে গুঁড়া চালে
খাবে শীতের পিঠা,
নানাবাড়ি যেতে হবে
খেতে পুলি-পিঠা।
শীত এলে তাই আনন্দ পাই
কাজে ও মনে,
কেন যে শীত চলে যায়
অল্প সময়ে!
শীতের দিনে ইবাদতে
হও আগুয়ান
শীতের ভিড়ে কষ্ট করে
বাড়াও সম্মান।

নতুন বছর

-মিজানুর রহমান
মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।

নতুন বছর আসলো আবার
আসলো নতুন হাওয়া,
চলে যাওয়া সময়গুলো
আর যাবে না পাওয়া!
গত সময় পার করেছি
হয়তো এলোমেলো,
আগাম বছর যেন মোরা
জ্বালায় দ্বীনের আলো।
এলোমেলো না কাটিয়ে
আমার জীবন তরি,
সময় থাকতে পুণ্যকামে
নেকের খাতা ভরি।

পেতে হলে সুখ

-মিজানুর রহমান
মাওনা বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর।

দুনিয়ার রঙে মোরা হয়েছি রঙিন,
কবরের কথা ভুলে গেছি রাতদিন।
হামেশায় গুনাহ করে কেটে যায় বেলা,
জীবনের দামি কাল করি অবহেলা।
দুনিয়ার হায়াতের নিভে গেলে বাতি,
কবরে একা যাব রবে নাকো সাথী।
এসো তাই পরপারে পেতে হলে সুখ,
আখেরাতমুখী হই ছেড়ে যত ভোগ।

যদি মুসলিম হয়ে থাকো

-মিরাজুর রহমান তাহমিদ
অষ্টম শ্রেণি, আল-মাদরাসাতুদ দ্বীনিয়া,
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।

ফজর কাটে কেন তোমার
শুয়ে থেকে খাটে,
যোহর কাটে পাঠশালাতে
আছর খেলার মাঠে।
মাগরিবেতে ঘোরাফেরা
এশায় লেখাপড়া,
প্রস্তুত আছো পরতে তুমি
জাহান্নামের কড়া?
যদি তুমি মুসলিম হও
তবে ছালাত ধরো,
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক
আরও দৃঢ় করো।

রাজনীতি

-মুস্তাকিম বিল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

রাজনীতি করে ক্ষতি
বাড়ায় শত্রু অনেক,
আসল নীতি নিয়ে চলো
খাটিয়ে নিজের বিবেক।
যে রাজনীতি করি মোরা
চলি সবার সাথে,
মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিয়ে
অস্ত্র মোদের হাতে।
রাজের নীতি প্রজার কাঁধে
চাপিয়ে দিয়ে ক্ষতি,
ডাকনাম তাই রেখেছি মোরা
সুখের রাজনীতি।
ইয়াহূদীর চিন্তা ধারায়
ভাসিয়ে দিয়ে মন,
চোখ জানালা বন্ধ করে
ভাঙছি রক্ত বাঁধন।
পত্রিকাতে রাখলেই চোখ
চক্ষু চড়কগাছ,
দলীয় বলে করছে যা তাই
ভাবছে না আগপাছ।
গণতন্ত্রের পাতায় পাতায়
লোভ লালসার নীতি,
কুরআন খুলে নাও শিখে
শান্তির রাজনীতি।
মানুষের মন থাকবে সদা
ছড়িয়ে দিতে প্রীতি,
তবেই হবে কায়েম মোদের
ইসলামী রাজনীতি।

শীতের ছুটি

-সাদিয়া আফরোজ
হাজীর হাট কাঁটাবাড়ি মিলবাজার, রংপুর।

এসে গেল শীতের ছুটি
যাবে নানুর বাড়ি,
খোকা খুকি দারুণ খুশি
চড়বে নতুন গাড়ি।
খোকা হাতে প্লেনটা নিয়ে
খেলছে দেখ না বেশ,
খুকি সঙ্গে খেলনা নিয়ে
চলল নানুর দেশ।
বছরের তো দুটো ছুটি
গ্রীষ্ম আর শীতে,
এই দুই সময় নানুর বাড়ি
খোকা খুকি যেতে।
নানুর বাড়ি মারামারি
চলে ভাই-বোন মিলে,
মামা, খালা, ফুফাতো সব
ভাই-বোন নামে ঝিলে।
ছুটি শেষে বাড়ি ফিরে
নানা নানি একা,
আসছে বছর আবার হবে
শীতে গ্রীষ্মে দেখা।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির খতিয়ান

বর্তমান দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিভীষিকাময় বলে জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। ২০২২ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে বিদায়ী বছরে সারা দেশে ৪৭৯টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭০ জন। আহত হন ৬ হাজার ৯১৪ জন। এ বছর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ১৯ জন। শুধু র‌্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৪ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাযতে আরো ১৫ জন নিহত হয়েছেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে মামলা হয়েছে ২২৪৯টি। অপহরণ, গুম ও নিখোঁজ হয়েছেন ৫ জন। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৬৯৪টি। খুন হয়েছে ১২৬ জন নারী। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯৩৬ জন। অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ১২ জন নারী। শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৪৫টি। এ ধরনের ঘটনায় নিহত হয়েছে ৪৭৪ শিশু। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিদায়ী বছর সীমান্তে হত্যার শিকার হয়েছেন ২১ জন। গণপিটুনিতে মারা গেছেন ৩৬ জন। কারা হেফাযতে মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। এছাড়া ২০২২ সালে সংখ্যালঘুদের ওপর ১২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২১০ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন।

২০২২ সালে ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদায়ী ২০২২ সালে ৭ হাজার ৬১৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ হাজার ৮৫৮ জন নিহত এবং ১২ হাজার ৮৭৫ জন আহত হয়েছেন। তাতে বলা হয়, ওই সময় রেলপথে ৬০৬টি দুর্ঘটনায় ৫৫০ জন নিহত, ২০১ জন আহত হয়েছেন। নৌপথে ২৬২টি দুর্ঘটনায় ৩৫৭ জন নিহত, ৩৫৭ জন আহত এবং ৭৪৩ জন নিখোঁজ হয়েছেন। দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সড়ক, রেল ও নৌ-পথে দুর্ঘটনার সংবাদ মনিটরিং করে প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ২০২১ সালের চেয়ে ২০২২ সালে সড়কে দুর্ঘটনা ১৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ ও প্রাণহানি ২৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৮ বছরে নিবন্ধিত যানবাহনের পাশাপাশি ছোট যানবাহন বিশেষ করে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংখ্যা ৪গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইজিবাইক, মোটরসাইকেল ও থ্রি-হুইলার সরকারি আদেশ অমান্য করে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে অবাধে চলাচল করেছে। এসব কারণে গত ৮ বছরের মধ্যে ২০২২ সালে সড়কে সর্বোচ্চ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে বলে পর্যবেক্ষণে ওঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

২০২২ সালে ৬৫০০ ফিলিস্তীনীকে আটক করেছে ইসরাঈল

২০২২ সালের শুরু থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৫০০ ফিলিস্তীনীকে আটক করেছে ইসরাঈল। আটকদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু আছে। বেশিরভাগ ফিলিস্তীনীকেই বিনা কারণে আটক করা হয়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘ফিলিস্তীনী প্রিজনার সোসাইটি’ এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরাঈলী বাহিনীর হাতে আটক বন্দিদের মধ্যে ১৫৩ জন নারী এবং ৮১১ জন শিশু রয়েছে। এসব শিশুর বয়স ১৪ বছরের কম। অথচ ইসরাঈলী আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কারাবাসের অনুমতি দেওয়া হয় না। ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইসরাঈলী বাহিনী যে ৬৫০০ ফিলিস্তীনীকে আটক করেছে তাদের মধ্যে ২১৩৪ জনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। ইসরাঈলী জেলে থাকা অবস্থায় এদের বিচার হয়েছে কি-না তাও জানা যায়নি। ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ কারো বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আটকাদেশ জারি করলে কোনো অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই ছয় মাসের জন্য সেই ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। পরে এ কারাদণ্ডের মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।

ভারতের সমীক্ষা : দাম্পত্যে ফাটল ধরাচ্ছে স্মার্টফোন

স্মার্টফোন যাপিত জীবনের সবচেয়ে বড় অনুষঙ্গ। অনেকের স্মার্টফোন ছাড়া চলে না। ফোন মানুষকে এগিয়েও নিয়েছে। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক রয়েছে। তবে ভারতে চালানো এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, অধিকাংশ দম্পতি মনে করেন, স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার তাদের সম্পর্কের ক্ষতি করেছে। সমীক্ষা চালানো হয়েছিল দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ এবং পুনের মতো বড় শহরে। সমীক্ষার জন্য হাজারের বেশি দম্পতিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ মনে করেন, স্মার্টফোন তাদের সঙ্গে

অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, আলাদা করা যাবে না, স্বামী কিংবা স্ত্রী প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টার মতো সময় ব্যয় করেন স্মার্টফোনে। ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, স্মার্টফোনের কারণে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্তত ৭০ শতাংশ স্বামী কিংবা স্ত্রী বলছেন, স্মার্টফোনে ডুবে থাকা অবস্থায় কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা বিরক্ত হন। স্মার্টফোন ব্যবহারকারী ৭০ শতাংশ দম্পতি বলেছেন, স্মার্টফোনের বেশি ব্যবহার তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে কাটানো সময়ের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। ৬৯ শতাংশ বলেছে, স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যাহত হচ্ছে। উত্তরদাতাদের ৮৮ শতাংশ একমত যে, স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

মুসলিম বিশ্ব

মুসলিম বিশ্বের বাণিজ্যকেন্দ্র হচ্ছে মক্কা-মদীনা

মুসলিম বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্র পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনাকে ইসলামী বিশ্বের আর্থিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে সঊদী আরব। এই লক্ষ্যে সঊদী আরবের তিনটি অর্থনৈতিক সংস্থা একসঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে। মক্কা চেম্বার অফ কমার্স, মদীনা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ইসলামিক চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল, ইসলামী সহায়তা সংস্থা (ওআইসি)-এর ৫৭ সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মক্কা ও মদীনা দুই পবিত্র শহরকে ইসলামী বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত করতে এবং মক্কা ও মদীনার পবিত্র মর্যাদাকে বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করা এবং এই দুটি শহরকে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের কেন্দ্রে রূপান্তর করা। মক্কা চেম্বার অব কমার্স ও মদীনা চেম্বার অব কমার্স জানিয়েছে, চুক্তিটি ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধের প্রচারে পবিত্র এই দুই শহরের ভূমিকা তুলে ধরবে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

সমুদ্রের পানি থেকে তৈরি হবে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ!

পরিবেশবান্ধব উপায়ে সমুদ্রের পানি থেকেই বিদ্যুৎ তৈরি করতে চলেছে মাদ্রাজ আইআইটি। সমুদ্রের পানি থেকে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা যাবে। তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন সৈকত থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। সিন্ধুজা-আই নামের একটি যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করা হবে। নৌকার মতো দেখতে এই যন্ত্রটিতেও হাল আর বৈঠা আছে। তার মধ্যে রাখা হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র। ঢেউ আসলে এই নৌকাটিও ওঠা নামা করবে। সেই সময়ে বৈঠাটি পানি কাটানোর চেষ্টা করবে। এই পরিস্থিতিতে পানির যে গতি আর চাপ তৈরি হবে, সেই চাপকে কাজে লাগাবে নৌকার ভিতরের বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রটি। এইভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে তা কাজে লাগানো যাবে।

জামি'আহ সংবাদ

সালাফী কনফারেন্স-২০২২

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী **'সালাফী কনফারেন্স-২০২২'** বিভাগীয় শহর রাজশাহীর পবা থানার অন্তর্গত ডাঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর সুবিশাল মাঠে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ।* আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সে বিপুল সংখ্যক ইসলাম প্রিয় মানুষ দলে দলে উপস্থিত হন। পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে বিমান, বাস, মাইক্রো-বাস, ট্রেন ইত্যাদি যোগে দ্বীনদরদী মুসলিম ভাই-বোনেরা কনফারেন্সে উপস্থিত হন।

১ম দিন বাদ আছর আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী-এর হিফয বিভাগের ছাত্র সালিম আহমেদ-এর কুরআন তেলাওয়াত ও তার সাথীদের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামী সংগীত পরিবেশন করে নূরানী বিভাগের ছাত্র জাবির ও তার দল। যথারীতি উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হাফিযাহুল্লাহ।

সালাফী কনফারেন্সে ১ম দিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ মোস্তফা মাদানী, ড. আবুবকর মুহাম্মাদ

যাকারিয়া, আখতারুল আমান মাদানী, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ মানযূরে ইলাহী, শায়খ ড. ইমাম হুসাইন, ড. রেজাউল করীম মাদানী, আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান, মাহবূবুর রহমান মাদানী, আব্দুর রহমান আল-কারামী প্রমুখ।

অনলাইন লাইভে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন পাকিস্তানের 'কুরআন ও সুন্নাহ আন্দোলন'-এর চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তানের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ মুনাযির ও বাগ্মী আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ। তিনি উর্দূ ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন এবং তার বক্তব্য ভাষান্তর করেন শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক।

প্রথম দিন বাদ এশা আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর বালক শাখার ছাত্ররা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়। উক্ত উনুষ্ঠানে ছাত্রদের শিক্ষণীয়, মননশীল ও সুস্থ ধারার বিনোদনে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী মুগ্ধ হন।

সালাফী কনফারেন্স ২০২২-এর ২য় দিন বাদ ফজর হিফয বিভাগের ছাত্র নাবিল আহমাদ-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সকালের অধিবেশন শুরু হয়। দারসে কুরআন পেশ করেন শায়খ আব্দুর নূর মাদানী। এরপর চলে সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ পর্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আব্দুল বারী বিন সোলায়মান এবং ফৎওয়া প্রদান করেন আব্দুর নূর মাদানী, আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী ও সাইদুর রহমান রিয়াদী। তারপর আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাওয়াতী সমাবেশ ও মাসিক আল-ইতিছাম এজেন্ট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল পরিমাণ দাঈ; মাসিক আল-ইতিছামের গ্রাহক ও এজেন্ট অংশগ্রহণ করেন। জুম'আর খুৎবা পেশ ও ইমামতি করেন কনফারেন্স এর সভাপতি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

২য় দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী-এর হিফয বিভাগের ছাত্র সাজিদ আহমাদ আর ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন ৭ম শ্রেণির ছাত্র আদনান। এদিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী, শায়খ আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম, শায়খ ড. লোকমান হোসাইন, ড. আব্দুল বাসীর, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, শায়খ নজরুল ইসলাম সালাফী, শায়খ আব্দুর রহমান সালাফী, সাইদুর রহমান রিয়াদী, আব্দুল বারী বিন সোলায়মান, গোলাম রব্বানী, আব্দুল কাদের মাদানী (ভারত), হাসান আল বান্নাহ মাদানী (ভারত) প্রমুখ।

এছাড়াও সম্মানিত অতিথির বক্তব্য পেশ করেন ভারতের বিখ্যাত জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, বানারাসের সাবেক মুহাদ্দিছ ও বর্তমান আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়ার সিনিয়র মুহাদ্দিছ শায়খ ইউসুফ মাদানী হাফিযাহুল্লাহ। তিনি উর্দূ ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন এবং তার বক্তব্য ভাষান্তর করেন শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক।

কনফারেন্সের ২য় দিন জামি'আহর বালিকা শাখার ছাত্রীদের একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা, আরবী ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর ও সাবলীল পরিবেশনা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে চমৎকৃত করে। শ্রোতারা মুগ্ধ উপভোগ করেন তাদের পরিবেশনা। এরপর জামি'আহর হিফয বিভাগ থেকে হিফয ও দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের পাগড়ী ও প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়।

সালাফী কনফরেন্স-২০২২-এ বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, আব্দুল বারী বিন সোলায়মান, আখতারুজ্জামান বিন মতীউর রহমান, আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ প্রমুখ।

সমাপনী ভাষণ : কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দ্বীনী ভাইদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তিনি আগত সকল শ্রোতামণ্ডলীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী, দেশ ও জাতির জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে এবং বৈঠক শেষের দু'আ পাঠের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আমরা জানি যে ফেরেস্তা নূরের তৈরি। জিন আগুনের তৈরি। মানুষ মাটির তৈরি। তাহলে মাছ, গরু, ছাগল, উট, কিসের তৈরি? সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-ছিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: জীন-ইনসান ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্য সকল জীব-জন্তু কীসের তৈরী এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট কোনো দলিল জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে উলামাদের দুটি মত পাওয়া যায়। ১. পানি দ্বারা তৈরী। দলিল- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ জমিনের উপর প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণিকে আল্লাহ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন... (সূরা নূর, ২৪/৪৫)। এ আয়াত থেকে প্রমান হয় জীব-জন্তু পানি দ্বারা সৃষ্টি। ২. মাটি দ্বারা তৈরী। দলিল: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকুল একত্রিত করা হবে; চতুষ্পদ জন্তু, যমিনে বিচরণশীল প্রাণি, পক্ষিকুল ও সবকিছুই। তখন আল্লাহর ইনছাফ বাস্তবায়ন হবে এভাবে যে, তিনি শীংওয়ালা জন্তু থেকে শীং ছাড়া জন্তুর জন্য (যে শীং ছাড়া জন্তুকে গুতো দিয়ে জুলুম করেছিল) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। (তাকে দিয়ে শীংওয়ালা জন্তুকে গুতো মেরে)। অতঃপর বলবেন, তুমি মাটি হয়ে যাও। ঠিক সেই মুহূর্তে কাফের ব্যক্তি বলবে, হায়! আমার আফসোস, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম,তাহলে কতোই না ভালো হতো! (সিলসিলা ছহীহা, ৪/৪৬৬)। এ হাদীছের আলোকে তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন সবশেষে তাদের মাটিতে পরিণত করবেন, তখন বুঝা যায় যে তাদের সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো মাটি। মহান আল্লাহ বলেন, 'সেদিন আমরা আসমান গুটিয়ে নিব যেভাবে কিতাবসমূহ গুটিয়ে নেয়া হয়, যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো... (সূরা আম্বিয়া, ২১/১০৪)।

প্রশ্ন (২) : দুনিয়া থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া সম্ভব কি? কোনো ছাহাবী কি দুনিয়াতে জান্নাতের সুবাস পেয়েছেন?

-তাজুল ইসলাম
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, গাজীপুর সিটি।

উত্তর: দুনিয়াতে জান্নাতের সুবাস পাওয়া সম্পর্কে কথিত বক্তাদের মুখে যে কথা সমাজে ছড়ানো হচ্ছে সেটি তাদের মিথ্যা দাবী মাত্র। কেননা কোনো ছাহাবী, তাবেঈন বা তাবে-তাবেঈন হতে এরুপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ 'তোমাদের নিকট কোন ফাসেক্ব কোন সংবাদ নিয়ে আসলে, তা যাচাই করে দেখ (আল-হুজরাত, ৪৯/৬)। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, সে যা শুনবে তার সত্যতা যাচাই না করে তাই বলবে (মুসলিম, হা/৫; আবূ দাউদ, হা/৪৯৯৪; মিশকাত, হা/১৫৬)। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ -কে কবরে কাফন-দাফন করার পর তার কবর হতে সুগন্ধি বের হওয়ার কারণে মানুষেরা কবরের মাটি নেওয়ার জন্য প্রচন্ড ভীড় করতে লাগলো বলে বুখারীর ভূমিকায় যে কথা প্রচলিত আছে তার সঠিক তথ্য প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (৩) : মানহাজ কাকে বলে? মানহাজ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? জনৈক আলেম বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সালাফী মানহাজ অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রশ্ন হলো সালাফী মানহাজ বলতে কী বুঝায়?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোত পাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: মানহাজ শব্দের আবিধানিক অর্থ: পথ বা চলার পথ, সরল পথ। আর সালাফী মানহাজ বলতে, পূর্ববর্তীগণ তথা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবী, তাবেঈগণ যে পথের উপর ছিলেন তাকেই সালাফী বা সালফদের মানহাজ বলা হয়। আর ছাহাবীগণের মানহাজ কী ছিল তা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي অর্থাৎ 'আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর আছি' (তিরমিযী, হা/২৬৪১)। সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সালাফী মানহাজ ও আক্বীদার উপর থাকা প্রত্যেকের উপর জরুরি।

প্রশ্ন (৪) : শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় জান্নাত দেখতে পায়। কথাটি কি সঠিক?

-জামালুদ্দীন
টাংগাইল।

উত্তর: হাদীছটি ছহীহ। আল্লাহর নিকটে শহীদদের জন্য ৬টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে (ক) শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পড়তেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান বের হওয়ার প্রাক্কালেই তাকে জান্নাত দেখানো হয় (খ) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয় (গ) ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হতে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয় (ঘ) সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মুক্তা দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছু হতে উত্তম (ঙ) তাকে ৭২ জন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হুরের সাথে বিয়ে দেয়া হবে এবং (চ) ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে (তিরমিযী, হা/১৬৬৩, 'জিহাদের ফযীলত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৫; মিশকাত, হা/৩৮৩৪)।

প্রশ্ন (৫) : অছীলা কাকে বলে? শরী'আতে কোন কোন অছীলা বৈধ আর কোন কোন অছীলা অবৈধ?

-সোলাইমান
দিনাজপুর।

উত্তর: কোন উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য মাধ্যম গ্রহণ করাকে 'অছীলা' বলে। এটি দুই প্রকার। (ক) শরী'আত সম্মত

সঠিক অছীলা। (খ) শরী'আত বহির্ভূত অছীলা। প্রথম প্রকারের অছীলা আবার কয়েক প্রকার। (১) আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মাধ্যমে অছীলা গ্রহণ করা (মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৭১২; মিশকাত, হা/২৪৫২; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৯৯, সনদ ছহীহ)। (২) আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে অছীলা গ্রহণ করা (নাসাঈ, হা/১৩০৫-১৩০৬; মিশকাত, হা/২৪৯৭, সনদ ছহীহ)। (৩) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে অছীলা করা (আলে-ইমরান ১৯০-১৯৩)। (৪) সৎ আমলের অছীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা (ছহীহ বুখারী, হা/২২৭২)। (৫) নিজের অবস্থা আল্লাহর কাছে তুলে ধরে অছীলা দেয়া। যেমনটি যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজের দুর্বলতা তুলে ধরে অছীলা দিয়েছিলেন (মারইয়াম, ৪)। (৬) সৎকর্মশীলদের দু'আর অছীলা দেয়া (ছহীহ বুখারী, হা/১০১০, ১/১৩৭ পৃ. (ইফাবা হা/৯৫৫, ২/২৩৫ পৃ.); মিশকাত, হা/১৫০৯)। দ্বিতীয় প্রকার অছীলা শরী'আত বহির্ভূত। যেমন মৃত ব্যক্তির অছীলা দেয়া, তথাকথিত বিভিন্ন অলি-আওলিয়ার অছীলা করা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানের অছীলাও জায়েয নেই (ফৎওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-৯৩)।

প্রশ্ন (৬) : (রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন) 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন'। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-আয়েশা সিদ্দিকা
নাটোর।

উত্তর: সমাজে প্রচলিত উক্ত কথার পক্ষে কোন জাল বর্ণনাও নেই। শুধু মানুষের মুখে মুখেই প্রচলিত। তাই প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বর্ণনাটিকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, لَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا الْمَبْنَى 'উক্ত শব্দে কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি' (আল-আছারুল মারফ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃ. ৪৩)। বরং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরি (আল-কাহফ, ১১০; আর-রূম, ২০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৬)।

প্রশ্ন (৭) : পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হল, 'মাতৃগর্ভে কোন সন্তান আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না'। কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে তা দেখা সম্ভব হচ্ছে। তাহলে কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা কি?

-আব্দুল গফুর
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : পবিত্র কুরআনের উক্ত ভাষ্য সম্পর্কিত আয়াতের অনুবাদ হল, 'নিশ্চয় ক্বিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কী লালিত-পালিত হয়। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত' (লুক্বমান, ৩৪)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হল, তিনটি স্তর ভেদ করে সন্তান জন্মগ্রহণ করে (আয-যুমার, ৬)। যার প্রথম স্তর হল, রেহেম বা মাতৃগর্ভে অবস্থিত শুক্রকীট (আল-মুমিনূন, ১২-১৪; ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৫৪)। যা থেকে কোন সন্তান জন্মলাভ করবে; তার আকার-আকৃতি কী হবে; এবং কী কল্যাণ বা অকল্যাণ নিয়ে সে আগমন করবে তা মানুষ তিন চল্লিশের পূর্বে জানতে পারে না। বরং তিন চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার পর যখন তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয় তারপরই মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র তার আকার-আকৃতি সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারে। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ও কল্যাণ-অকল্যাণ, সৎ-অসৎ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৪/৪৩৫ পৃ.)।

প্রশ্ন (৮) : ইসলাম কি কোয়ান্টাম মেথড-এর অনুমোদন দেয়?

-ইবাদুর রহমান
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইসলাম কোয়ান্টাম মেথড-এর অনুমোদন দেয় না। কেননা কোয়ান্টাম মেথড-এর কিছু নিয়ম-নীতি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন, (ক) এর অন্যতম নীতি হল, নিজের উপর তাওয়াক্কুল করা বা ভরসা করা। এটা বলে ভক্তদেরকে শেখানো হয় যে, তুমি চাইলেই সবকিছু করতে পার। ফলে তারা নিজেদের হাতে মূল্যবান কোয়ান্টাম বালা পরে ও তার উপর ভরসা করে। যা গায়রুল্লার উপর ভরসা করার নামান্তর ও স্পষ্ট শিরক। অথচ ইসলাম আল্লাহর উপর ভরসা করতে শিখায় (আলে-ইমরান, ১৫৯)। (খ) মেডিটেশনের জন্য ধর্ম বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই। এ যেন ভক্তদেরকে কোয়ান্টামগুরুদের গোলাম বানানোর এক অভিনব কৌশল। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, তা কবূল করা হবে না। ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আলে-ইমরান, ৮৫)। (গ) মেথড বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মেডিটেশন একটি ইবাদত। যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম করেছেন। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস। কেননা নিঃসঙ্গতা আর মেডিটেশন এক নয়। তাছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পরে কখনও ধ্যান করতে হেরা গুহায় যাননি। এমনকি ছাহাবায়ে কেরামও কখনও যাননি। (ঘ) এদের আরেকটি বিশ্বাস হল মাটির ব্যাংক। যে যেই নিয়তে এই ব্যাংকে টাকা রাখবে তার সে নিয়ত পূর্ণ হবে। প্রথমবারে পূরণ না হলে বুঝতে হবে মাটির ব্যাংক এখনো সন্তুষ্ট হয়নি। এটাও স্পষ্ট শিরক।

প্রশ্ন (৯) : সর্বপ্রথম তাওহীদের শ্রেণী বিন্যাস করেন কে?

-আকরাম খাঁ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর: প্রথমত, শরী'আতকে সহজভাবে বুঝানোর জন্য ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাস করে থাকেন। কোনো একটি বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাস কারো কারো নিকট বিভিন্ন হলেও তার সারকথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই হয়। তাছাড়া এই শ্রেণীবিন্যাস সর্বযুগে বিদ্যমান থাকা যরূরীও নয়। দ্বিতীয়ত, তাওহীদের শ্রেণীবিন্যাস কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ থেকে গৃহীত। কে সর্বপ্রথম তাওহীদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন, তা বলা মুশকিল। তবে, আদিকাল

থেকেই এই শ্রেণীবিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইমাম আবূ হানীফা {(মৃত্যু : ১৫০ হিঃ), এর দিকে সম্পর্কিত আল-ফিক্বহুল আবসাত্ব, পৃ. ৫১}, আবূ ইউসুফ {(মৃত্যু : ১৮২ হিঃ), ইবনু মান্দাহ, কিতাবুত-তাওহীদ, ৩/৩০৪-৩০৬ পৃ.}, ইবনু জারীর আত-ত্বাবারী {(মৃত্যু: ৩১০ হি:), জামেউল বায়ান, ২৬/৫৩-৫৪ পৃ.}, আবূ জা'ফর আত-ত্বহাবী আল-হানাফী {(মৃত্যু : ৩২১ হিঃ), আল-আক্বীদাহ আত-ত্বহাবিইয়্যাহ, পৃ. ৩১}, ইবনু মান্দাহ {(মৃত্যু : ৩৯৫ হিঃ), কিতাবুত-তাওহীদ, ১/৬১-১১৬ পৃ.} প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে তাওহীদের এই শ্রেণীবিন্যাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) এই শ্রেণীবিন্যাসকে আরো বেশি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন মাত্র।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০) : যে ব্যক্তি নড়াচড়া করতে পারে না, সে কীভাবে তায়াম্মুম করবে?

-মোরাসালীন
ঢাকা।

উত্তর: যে ব্যক্তি নড়াচড়া করতে পারে না, তাকে কেউ তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। আর যদি তায়াম্মুম করানোর মতো কোনো ব্যক্তি না থাকে তাহলে তায়াম্মুমের নিয়ত করে ছালাত আদায় করবে। কেননা সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল (ছহীহ বুখারী, হা/১)। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো' (আত-তাগাবুন ১৬)। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের বাহিরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না' (আল-বাক্বারা, ২৮৬)।

প্রশ্ন (১১) : মেয়েদের মাসিকের সর্বনিম্ন সময় কত দিন? তিন দিন পর যদি মাসিক বন্ধ হয় তাহলে ওযূ বা গোসল করলেই পবিত্র হয়ে যাবে কি?

-মোহাম্মদ আব্দুল কাদের
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: মেয়েদের মাসিকের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ সময় নির্ধারিত নয়। বরং তা তাদের ব্যক্তিগত অবস্থার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, লোকেরা তোমাকে ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বল, তা অশুচি। কাজেই তোমরা ঋতুকালে স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাক এবং যে পর্যন্ত পবিত্র না হয় সে পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না (আল-বাক্বারা, ২/২২২)। আয়েশা হজ্জের সময় ঋতুবতী হয়ে পড়লে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি অপেক্ষা কর, এরপর যখন হায়েয হতে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তুমি তানঈম চলে যাও এরপর তালবীয়া পাঠ করতে থাক (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৮৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১২১১)। উক্ত আয়াত ও হাদীছ হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মেয়েদের মাসিকের নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। তাই কোনো মহিলার যদি তিন দিন পরে মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে গোসল করার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে ছালাত, ছিয়াম পালন করতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

ছালাত

প্রশ্ন (১২) : যোহর ছালাতের সময় মসজিদে এমন সময় উপস্থিত হলাম যে, ফরযের পূর্বের চার রাকআত ছালাত আদায় করার সময় হচ্ছে না। কিন্তু দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার মতো সময় আছে। এমতাবস্থায় কি করবো?

-এম. হুমায়ুন কবির
সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর: এমতাবস্থায় দুই রাকআত সুন্নত আদায় করবে। কেননা যোহরের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নত পড়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 'আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ছালাত আদায় করেছি ১০ রাকআত- যোহরের পূর্বে ২ এবং পরে ২ রাকআত, এবং জুমআর পরে ২ রাকআত, মাগরিবের পরে ২ রাকআত, ঈশার পরে ২ রাকআত ও ফজরের পূর্বে ২ রাকআত (ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৭)।

প্রশ্ন (১৩) : যদি মিরাজের রাত্রিতে ছালাতের বিধান কার্যকর হয়ে থাকে, তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম –এর স্ত্রী সারা জালেম বাদশাহর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কিভাবে ছালাত আদায় করে ছিলেন?

-সোলাইমান ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: মিরাজের রাতে যে ছালাত ফরয হয়েছিল তা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য খাছ ছিল। আর ছালাতের বিধান পূর্বের নবীদের জন্যও ছিল। তবে, তা কত ওয়াক্ত ছিল, কত রাকআত ছিল, কোন সময়ে ছিল তা জানা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, '(ইবরাহীম আ. বললেন) 'হে আমার রব, আমাকে ছালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও... (ইবরাহীম, ১৪/৪০)। তিনি আরো বলেন, 'আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের কাছে ওহী পাঠালাম যে, 'তোমরা তোমাদের কওমের জন্য মিসরে গৃহ তৈরী কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কিবলা বানাও আর ছালাত কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও' (ইউনুস, ১০/৮৭)। এরূপ আরো অনেক আয়াতের পূর্বের নবীগণের ছালাতের বিষয়টি জানা যায়।

প্রশ্ন (১৪) : বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামী এবং স্ত্রীর একত্রে যে দুই রাকআত নফল ছালাত আদায় করবে; সেই দুই রাকআত ছালাত কি স্বরবে হবে নাকি নিরবে হবে?

-গাজী মোহাম্মদ বিন হাবিব
নলছিটি, ঝালকাঠি।

উত্তর: বাসর রাতে মিলনের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী জামা'আত সহকারে দুই রাকআত ছালাত আদায় করা সুন্নাত (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/১৭৪৩৮, ১৭৪৪১)। এতে স্বামী ইমামতি

করবে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করবে (মুছান্নাফে ইবনি আবী শায়বাহ, হা/ ১৭৪৪১)। যদি বাসর রাতের বেলায় হয়, তাহলে ক্বিরা'আত জোরে পড়বে। আর যদি দিনের বেলায় হয়, তাহলে ক্বিরা'আত আস্তে পড়বে (আল-মাজমূ'উ শারহুল মুহাযযাব, ৩/৩৯১ পৃ.)। তবে কোন মহিলা ঋতুবতী অবস্থায় থাকলে তা পরবর্তীতে আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন (১৫) : রাত জাগার কারণে ফজরের ছালাত প্রায়ই ক্বাযা হয়ে যায়। স্কুলে গিয়েও সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় যোহরের ছালাত ক্বাযা হয়। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: ছালাতের ব্যাপারে উক্ত কথা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। সকল কাজের আগে ছালাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেকোনো মূল্যে নির্ধারিত সময়েই ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। এজন্য এশার পর অনর্থক গল্প-গুজব করা জায়েয নয়। তাই ফজরের ছালাতে সমস্যা হলে ইশার ছালাত পড়ে দ্রুত ঘুমিয়ে যেতে হবে। আবূ বারযা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথা-বার্তা বলা অপছন্দ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৭৯৬)। আর স্কুলে গিয়ে পরিবেশ নেই বলে ছালাত ক্বাযা করা জায়েয হবে না। বরং দায়িত্বশীল শিক্ষকদের বলে ছালাতের সময় ও পরিবেশ সৃষ্টি করে মসজিদে ছালাত আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে ছালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য' (আন-নিসা, ৪/১০৩)। আর ছালাত বাদ দিয়ে বা ছালাতকে তুচ্ছ মনে করে অন্য ইবাদত করে কোনো লাভ হবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব শুদ্ধ হলে তার সমস্ত আমলই শুদ্ধ হবে। আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে' (ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/১৮৫৯, সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩৫৮)। সুতরাং নিয়মিতভাবে ফজরের ছালাত ক্বাযা করার এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। আর ওয়াক্তমত ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এরপরও কোন কারণবশত কোনদিন ঘুম থেকে উঠতে না পারলে যখন জাগ্রত হবে, তখনই আদায় করে নিবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا 'যদি কেউ কোন ছালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই আদায় করে নিবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪; মিশকাত, হা/৬০৩)। উল্লেখ্য যে, ইশার পর অনর্থক গল্প-গুজব করা জায়েয নয়। তাই ফজরের ছালাতে সমস্যা হলে ইশার ছালাত পড়ে দ্রুত ঘুমিয়ে যেতে হবে। আবূ বারযা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথা-বার্তা বলা অপছন্দ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৭৯৬)।

প্রশ্ন (১৬) : আমাকে কেন আরবীতে ছালাত আদায় করতে হবে, যখন আমি সেই ভাষা বুঝিই না?। অনুগ্রহ করে যুক্তি না দিয়ে দলিল দিয়ে বুঝাবেন।

-মাহফুয রানা
রাজশাহী।

উত্তর: প্রথমত, শরীআতের বিধান সাব্যস্ত হয় অহীর মাধ্যমে। আর অহী নাযিল হয়েছে রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর উপর। তিনি যেভাবে বলেছেন আমাদেরকে সেভাবেই ছালাত আদায় করতে হবে। এখানে কারো কোনো কথা গ্রহণীয় হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে' (আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)। তিনি বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবে ছালাত আদায় করো (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৯৮৭)। সুতরাং এমন প্রশ্নই বাতিল। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন, إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ الصَّلَاةُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ অর্থাৎ আমাদের এই ছালাতের মধ্যে মানুষের কোনো কথা জায়েয নয়। ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তামহীদ এবং কুরআন তেলাওয়াতের নাম (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭; নাসাঈ, হা/১২১৮)। অন্যত্র আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» 'সূরা ফাতেহা ছাড়া কোনো ছালাত নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৪)। অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হবে না এবং ছালাতে নিজের কোনো কথা প্রবেশ করানো যাবে না। আর সূরা ফাতেহা যেহেতু আরবী ভাষায় তাই তা আরবীতেই পড়তে হবে আর ছালাতে যেহেতু নিজের পক্ষ থেকে কিছু প্রবেশ করানো যাবে না তাই নিজ ভাষাও সেখানে যুক্ত করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৭) : ১৫ শাবানের রাতকে কেন্দ্র করে জামাআত বদ্ধ হয়ে আবার একাকী বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করে থাকে। ১৫ শাবান রাতে কি বিশেষ কোনো ছালাতের কথা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে?

-নূরুজ্জামান
ঢাকা।

উত্তর: ১৫ শাবানের রাতকে কেন্দ্র করে যে ছালাত জামাআতবদ্ধভাবে বা একাকী বিশেষ পদ্ধতিতে আদায় করা হয় তা সম্পূর্ণ বিদআত। কেননা এ রাতে ছালাত আদায় সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবটাই জাল। আর

দলিল-প্রমাণ ছাড়া ছওয়াবের নিয়্যতে কোনো ইবাদত করার নামই বিদআত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা দ্বীনের মধ্যে নাই, তা প্রত্যাখ্যাত (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। আর কোনো দিন বা রাত নির্দিষ্ট করে ছালাত ও ছিয়াম পালন করা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা রাতসমূহের মধ্য থেকে জুমআর রাতকে নফল ছালাতের জন্য নির্ধারণ করো না, আর দিনসমূহের মধ্য থেকে জুমআর দিনকে ছিয়াম পালনের জন্য নির্ধারন করো না। তবে জুমআর দিন যদি সেই ছিয়ামের দিন হয় যা সে পূর্বে থেকে পালনে অভ্যস্ত তাহলে সেটা ভিন্ন কথা' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৪)। নির্দিষ্ট দিনকে কেন্দ্র করে যদি কোনো ইবাদত জায়েয হতো তাহলে জুমআর দিন ও রাত এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেত। যেহেতু নির্দিষ্ট করে জুমআর দিন ও রাতে ছিয়াম পালন ও ছালাত আদায় নিষিদ্ধ, সেহেতু অন্য দিন তো আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে। সুতরাং ১৫ শাবানের রাতে ছালাত আদায় করা শরীআত বিরোধী কাজ ও বিদআত।

নফল ছিয়াম

প্রশ্ন (১৮) : অনেকে ১৫ শাবানের দিন ছিয়াম রাখে। ১৫ শাবানের দিন ছিয়াম রাখা যাবে কি?

-মোশাররোফ
নওগাঁ।

উত্তর: পনেরো শাবানের দিন ছিয়াম রাখার কোনো ভিত্তি নেই। বরং এ বিষয়ে একটি হাদীছ আছে যা নিতান্তই যঈফ (ইবনু মাজাহ, হা/১৩৮৮; মিশকাত, হা/১৪)। তবে কেউ যদি প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সে তা আদায় করতে গিয়ে পনেরো তারিখের ছিয়াম রাখতে পারে। এতে কোনো বাধা-নিষেধ নাই।

প্রশ্ন (১৯) : শাবান মাসে আমাদের করণীয় কী?

-খায়রুল ইসলাম
কুমিল্লা।

উত্তর: ফযীলতপূর্ণ রামাযান মাসের আগমনবার্তা নিয়ে যে মাসটি আমাদের সামনে আবির্ভূত হয় তা হলো শাবান মাস। যা খানিকটা ফরয ছালাতের পূর্বে নফল ছালাত আদায়ের ন্যায়। এ মাসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক বেশি ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাধারে নফল ছিয়াম পালন করে যেতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম যে, হয়তো তিনি ছিয়াম ছাড়বেন না। আবার কখনো তিনি লাগাতার ছিয়াম রাখতেন না। অবস্থা এমন হতো যে আমরা গুঞ্জন করতাম, মনে হয় তিনি আর ছিয়াম রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে একমাত্র রামাযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। আমি তাঁকে শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে অধিক সংখ্যক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬)। উসামা ইবনু যায়েদ বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শাবান মাসে যে পরিমাণ ছিয়াম পালন করেন অন্য কোনো মাসে আমি আপনাকে ঐ পরিমাণ ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। তিনি বললেন, 'এটা এমন একটি মাস যে ব্যাপারে মানুষ বেখবর, যা রযব ও রামাযানের মধ্যকার একটি মাস। এটা এমন একটি মাস যাতে বান্দার আমলনামা রব্বুল 'আলামীনের নিকট উঠানো হয়। সুতরাং আমি ভালোবাসি যে, আমার আমল ছিয়ামরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট উঠানো হোক (নাসাঈ, হা/২৩৫৭)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে যত ছিয়াম পালন করতেন অন্য কোনো মাসে তত ছিয়াম পালন করতেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের সাধ্যে যতদূর সম্ভব আমল করো। কেননা, তিনি নেকী দেওয়া বন্ধ করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা আমল করে ক্লান্ত হয়েছো... (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫০১১)। এ হাদীছগুলো থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো তা হচ্ছে শাবান মাসে ছিয়াম রাখা। আর যতো দূর পারা যায় অন্যান্য নফল ইবাদত করার চেষ্টা করা। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত, নফল ছালাত আদায় করা, দান-ছাদাক্বা।

শবে মিরাজ

প্রশ্ন (২০) : ইসলামী শরীয়তে শবে মিরাজ উপলক্ষে বিশেষ ছালাত ও ছিয়ামের ভিত্তি কতটুকু?

-আব্দুর রহমান
বরিশাল।

উত্তর: শবে মিরাজ উপলক্ষে বিশেষ কোনো ছালাত বা ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ জাল ও বিত্তিহীন। কেননা এ দিনে ছিয়াম পালন ও ছালাত আদায়ের কোনো বিধান রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে জানা যায় না। তাই তা বিদআত। যদি থাকতো তাহলে তিনি নিজে তা করতেন বা বলে যেতেন। সুতরাং যার প্রমাণ ইসলামী শরীআতে নেই তা বিদআত বলে বিবেচিত হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই তা পরিত্যাজ্য' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (২১) : ইসরা তথা মিরাজের রাত্রি উদযাপন করার বিধান কি?

-আব্দুল্লাহ
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, ইসরা বা মি'রাজ রজনী একটি মহিমান্বিত রাত। তবে ইসরা ও মি'রাজের রাতকে

কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠান করা হয়, যে ইবাদত করা হয় তা একটি বিদআত। কেননা এ রাতটি অনির্দিষ্ট রয়েছে, কোন মাসে ও কোন তারিখে তা সংঘটিত হয়েছিল তা স্পষ্ট করে কিছু জানা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তিনি পুতপবিত্র যিনি তার বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত রাতের বেলায় ভ্রমন করালেন... (সূরা বনূ ইসরাঈল, ১৭/১)। আবার এ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অনুষ্ঠান করে যাননি। তার ছাহাবীদের বলে যাননি। তার মৃত্যুপরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদা ও ছাহাবায়ে কেরাম তাদের কেউ এ রাতে কোনো ইবাদত বা অনুষ্ঠান করেননি। সুতরাং অনির্ধারিত ইসরা ও মি‘রাজের রাতকে কেন্দ্র করে কোনো ইবাদত করা সম্পূর্ণ বিদআত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘রাসূল (মুহাম্মাদ) যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো’ (সূরা হাশর, ৫৯/৭)। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তাহলে তা পরিত্যাজ্য’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫১৭১)।

যিকির-আযকার

প্রশ্ন (২২) : মসজিদে প্রতিদিন ফজর ছালাতের পর ইমাম সূরা ইয়াসিন পড়েন এবং ইমাম সাহেব বাড়ি গেলে আমাকে পড়ার জন্য চাপ দেন। আমি জানতে চাই প্রতিদিন ফজর ছালাতের পর নিয়ম করে সূরা ইয়াসিন পড়ার বিধান কী?

-মো. সাহারুল ইসলাম
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: ফজর ছালাতের পরে সূরা ইয়াসিন পড়ার ফযীলত মর্মে যে হাদীছগুলো বর্ণিত হয়েছে; তার সবগুলোই যঈফ অথবা জাল (ইসলাম ওয়ায়িব, ফতওয়া নং- ৫৪৩৯৭; মুসনাদে দারেমী, হা/৩৪৬১)। তবে কোনো সূরা নিয়মিত পড়া বা মাঝে মধ্যে পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তা যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়। আর এ ক্ষেত্রে কোনো দলিল পাওয়া না যায় তাহলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করল যা আমার শরীআতের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৫)।

প্রশ্ন (২৩) : নবীর প্রতি ছালাত ও সালাম পেশ না করলে দুআ কবুল হয় না। দুআ ঝুলন্ত থাকে। এই মর্মে বর্ণিত হাদীছ কি ছহীহ? নবী ﷺ-এর প্রতি ছালাত ও সালাম পেশ না করে দুআ করা যাবে কি?

-মোঃ মামুনুর রশিদ প্রধান
রামচন্দ্রপুর,গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

উত্তর: জী, হাদীছটি ছহীহ (তিরমিযী, হা/৪৮৬)। দুআ করার ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা দুআ কবুলের একটি মাধ্যম (মিরআতুল মাফাতীহ, ৩/২৯০; ফায়যুল কাদীর, ৩/৫৪৩)। তাই সবার উচিত হবে দুআর ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ দুআ করবে তখন সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে অতঃপর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে এরপর যা ইচ্ছা দুআ করে (তিরমিযী, হা/৩৪৭৭)। উক্ত হাদীছে বুঝা যায় যে, দুআর সূচনাতে প্রশংসা ও দরূদ পড়া জরুরি একটি বিষয়।

প্রশ্ন (২৪) : বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আমল কী?

-নাজমুস সাকিব
বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: বিপদ মুক্তির আমলগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো- (১) অসচ্ছল ব্যক্তির অসচ্ছলতা দূরীভূত করা (মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৭৪৯)। (২) আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা (আছ-ছফফাত, ৭৬)। (৩) কতিপয় দুআ ও যিকির করা- (ক) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ العرش العظيم (খ) اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (গ) اللهُ اللهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ইত্যাদি (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৫; আবূ দাঊদ, হা/৫০৯০; ৩৮৮২)।

প্রশ্ন (২৫) : কুরআনের এমন কোনো নির্দিষ্ট তেত্রিশ আয়াত আছে কি যার অনেক ফযীলত রয়েছে?

-গোলাম রাব্বি
দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল সদর।

উত্তর: যে তেত্রিশ আয়াতের ফযীলতের কথা বলা হয় তা হচ্ছে সূরা বাক্বারার ১-৫, সূরা বাক্বারা ২৫৫-২৫৭, সূরা বাক্বারা ২৮৪-২৮৬, সূরা আরাফ ৫৪-৫৬, সূরা ইসরা, ১১০-১১১, সূরা সাফফাত ১-১১, সূরা রাহমান ৩৫-৩৩-৩৫, সূরা হাশর ২১-২৮, সূরা জীন ১-৪। ছহীহ হাদীছ দ্বারা এই তেত্রিশ আয়াতের বিশেষ কোনো ফযীলত বর্ণিত হয়নি।

বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (২৬) : আমি মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি না নিয়ে কোর্ট মেরেজ করেছি এবং সংসার করছি। কিছু আলেম বলছেন, বিবাহ হয়ে গেছে আর কিছু আলেম বলছেন, বিবাহ হয়নি। এখন মেয়ে আমার সাথে সংসার করবে না। প্রশ্ন হলো- এখন আমি যদি তাকে তালাক দিই তাহলে কি মোহরানা পরিশোধ করতে হবে? যদি বিবাহ না হয়ে থাকে তাহলে মোহরানা কেন পরিশোধ করবো?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সাপদী,বাঘড়া বাজার, চাঁদপুর।

উত্তর: মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোর্ট ম্যারেজের মাধ্যমে যে বিবাহ চালু রয়েছে তা শরীআত সম্মত নয়। বরং মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি ক্রমেই বিবাহ সম্পাদন করতে হবে। নতুবা বিবাহ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। নবী ﷺ বলেছেন, ‘যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৪১৭; আবূ দাঊদ,

হা/২০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিবাহ শরীআত সম্মত নয়। তাই এই বিবাহ হয়নি। এর মাঝে যে সম্পর্ক হয়েছে তা যেনা হিসেবে গণ্য। এর জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করতে হবে। তবে, তার সাথে সহবাস করার কারণে মোহরানা আদায় করতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোনো নারী তার ওলীর (অভিভাবকের) অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে; তার বিবাহ বাতিল (না-মঞ্জুর, পরিত্যক্ত), তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। যদি এরূপ বিবাহতে স্বামীর সাথে সহবাস হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীর মোহর দিতে হবে তার (লজ্জাস্থান) উপভোগ করার জন্যে (তিরমিযী, হা/১১০২)। সেক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর উচিৎ মেয়ের অভিভাবকের উপস্থিতিতে মোহরানা পরিশোধ করত শরীআ পদ্ধতিতে নতুন বিবাহ সম্পাদন করা এবং তারপরে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী তিন পবিত্র অবস্থায় তিন তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন (২৭) : একজন ব্যক্তি তার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমি তার চাচাতো ভাইদের কাছে বিক্রি করতে চাইলে চাচাতো ভাইয়েরা কম দাম দিতে চায়। ফলে উক্ত ব্যক্তি সেই জমি বেশি দামে বাইরের একজন লোকের কাছে বিক্রি করে চাচাতো ভাইদের আর না জানিয়ে গোপনে দলিল করে দেয়। এতে কি চাচাতো ভাইদের হক নষ্ট হলো? যদি হয় এর জন্য কে দায়ী ক্রেতা নাকি বিক্রেতা?

-মেসবাহুল হক
কুয়েত।

উত্তর: পাশা-পাশি অবস্থিত সুবিধা ভোগী নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় আত্মীয়দের অবহিত করার পর তারা যদি বাজার মূল্য দিতে চাই তাহলে তাদেরকেই দিতে হবে। শরীআতের পরিভাষায় এটাকে হক্বে শুফআ বা শুফআর হক্ব বলা হয়। এ হক্ব ঐ সকল জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ভাগ করা যায় না এবং মাঝে কোনো সীমারেখা থাকে না। যাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সকল সম্পদ ভাগ করা যায় না সে সকল সম্পদে শুফআর বিধান কার্যকর করেছেন। তবে, যদি মাঝে কোন সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় অথবা রাস্তা ভিন্ন হয় তাহলে, তাতে শুফআর হক্ব নেই (ছহীহ বুখারী, হা/২০৯৯)। আর যদি তারা বাজার মূল্যের কম দিতে চাই এবং এর জন্য সে বেশি মূল্যে অন্যত্র বিক্রয় করে দেয় এতে দোষের কিছু নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি সঠিক কাজ করেছে। এর জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা কাউকে দায়ী করা যাবে না। তাই এখানে হক্ব নষ্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আর এ ক্ষেত্রে সে জুলুমও করেনি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা জুলুম করা হতে বেঁচে থাকো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৪১)। সুতরাং এমন বিক্রি গোপনে না করে প্রকাশ্যে করাই ভালো ছিল।

প্রশ্ন (২৮) : বিদেশী পণ্য বিশেষ করে কসমেটিক্স পণ্য যেগুলোতে আমদানী কারকের অনুমোদিত সিল নেই এমন পণ্যগুলো ক্রয় করা কি বৈধ?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: বিদেশী পণ্য হোক কিংবা দেশীয় পণ্য হোক বৈধভাবে আমদানী বা বাজার জাত করা হলে তা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। আর আমদানীকৃত পণ্যে যদি সিল বৈধতা এবং অবৈধতার প্রমাণ বহনকারী হয় তাহলে, সিলহীন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা তা ধোঁকার শামীল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর চালবাজ/ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৫৬৭; ছহীহুল জামে', হা/৬৪০৮)।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ

প্রশ্ন (২৯) : আমি আমার পিতা-মাতার দায়িত্ব পালন করছি। আমি যদি ভালো ভালো বাজার করি আমার মাতা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি ভালো বাজার না করি পিতা অসন্তুষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-তাজুল ইসলাম
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, গাজীপুর সিটি।

উত্তর: পিতা-মাতাকে নিজের সাধ্যানুযায়ী উত্তমভাবে তাদের খেদমত করতে হবে। সাধ্যের কম করাও যেমন ঠিক বৈধ হবে না তদ্রূপ সাধ্যের অতিরিক্ত করারও প্রয়োজন নেই। মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন... তোমার সাধ্যানুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য খরচ করো (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৫৭০; মিশকাত, হা/৬১)। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে' (আল-ইসরা, ১৭/২৯)। এখানে বদ্ধমুষ্টি অর্থ হচ্ছে কৃপণতা করা আর মুক্ত হস্ত অর্থ অপ্রয়োজনীয় খরচ করা (ইবনে কাসীর)। আর পরিবারের প্রয়োজনে খরচ করার মাধ্যমে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। আবূ মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলিম যখন ছওয়াবের প্রত্যাশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে। এ খরচ তার জন্য ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০২; নাসাঈ, হা/২৫৪৫; মিশকাত, ১৯৩০)। সুতরাং পিতা-মাতাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। যাতে তারা বিষয়টি বুঝতে পারে এবং উভয় সন্তুষ্ট থাকে।

বৈধ-অবৈধ

প্রশ্ন (৩০) : ছেলেরা কি চাঁদির আংটি ব্যবহার করতে পারবে এবং আংটির উপরে সৌন্দর্যের জন্য পাথর বসাতে পারবে?

-মোহাম্মদ রাহুল ইসলাম
দুর্গাপুর।

উত্তর: ছেলেরা চাঁদির আংটি পড়তে পারে। আর সৌন্দর্যের জন্য আংটির উপর পাথর বসাতে পারে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর একটি রূপার আংটি ছিল এবং তার নাগিনা (নাম অঙ্কিত স্থানটি)-ও ছিল রূপার। (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৭০; মিশকাত, হা/৪৩৮৭)। তবে, বর্তমান সময়ে রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের পাথর বসিয়ে যে আংটি ব্যবহার করা হয়, তা ব্যবহার করা শিরক। তবে, পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি হারাম।

প্রশ্ন (৩১) : অন্যের ছেলে বা মেয়ে দত্তক নেওয়া জায়েয আছে কি? থাকলে নেওয়ার উপায় কি?

-মো. সোলায়মান হোসেন
হরিপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর: অন্যের সন্তানকে দত্তক তথা লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নেওয়া জায়েয আছে। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনু হারেছা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ছেলে হিসেবে নিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৮২)। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি; ঐগুলি তোমাদের মুখের কথা' (আল-আহযাব, ৩৩/৪)। তবে, পালক সন্তানকে নিজ ছেলে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। তারা পালক পিতা-মাতার ওয়ারেছ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক' (আল-আহযাব, ৩৩/৫)। সুতরাং সার্টিফিকেট, আইডি, পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্য কোনো স্থানে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে পিতা-মাতার স্থানে তাদের নাম ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তাতে আপন পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা হবে এবং অন্যকে আপন পিতা-মাতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আর তা নিষিদ্ধ। কেননা এ সময় সে কাফের হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬১)। এবং জান্নাতও তার জন্য হারাম হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩২৬)। উল্লেখ্য যে, পালিত মার দুধ পান না করে থাকলে, সে মা মাহরামের অন্তভুর্ক্ত নয়। এমতাবস্থায় ছেলে হলে পালিত মা থেকে আর মেয়ে হলে পালিত বাবা থেকে পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন (৩২) : বর্তমানে যুবতী মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে বিউটিশিয়ানদের মাধ্যমে যেভাবে রূপচর্চা করছে, তা কি শরী'আত সম্মত?

-সিয়াম
যশোর।

উত্তর : আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তবে বর্তমানে বিউটিশিয়ানদের মাধ্যমে মেয়েরা যেভাবে রূপচর্চা করছে এবং চুল ছেঁটে, ভ্রু চিকন করে ও উলকী ব্যবহারের মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, তা শরী'আত সম্মত নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শরীরে উলকি অঙ্কনকারী, উলকি গ্রহণকারী, চুল-ভ্রু উত্তোলনকারী, দাঁত চিকনকারী ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারীদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন। কেননা তা তাঁর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়'.... (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৫; মিশকাত, হা/৪৪৩১)। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারী ও এর বেশধারী এবং শরীরে উলকি অঙ্কনকারী ও উলকি গ্রহণকারী নারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২২; মিশকাত, হা/৪৪৩০)।

প্রশ্ন (৩৩) : আল্লাহর ওয়াস্তে কারো কাছে কিছু চাওয়া বা কাউকে কিছু করতে বলা যাবে কি?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ কারোর কাছে কিছু চাইতে বা কিছু করার জন্য বলতে পারে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাইলে তাকে খালিহাতে ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাছে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় চায়, তখন তাকে আশ্রয় দেবে। আর যখন তোমাদের কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাইবে, তখন তোমরা তাকে দেবে (আবূ দাউদ, হা/৫১০৯)। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কী তোমাদের খারাপ লোক সম্পর্কে জানাব? সে ঐ ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় কিন্তু সে তাকে কিছুই দেয় না (তিরমিযী, হা/১৬৫২; নাসাঈ, হা/২৫৬৯; মিশকাত, হা/১৯৪১)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে; আমি কি তোমাদেরকে চিনাব? ছাহাবীগণ বললেন, জী হ্যাঁ; আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ কিছু চায়, আর সে তাকে কিছু দেয় না। (সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট)' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯১৮, ২৭৯২৭ মিশকাত, হা/১৮৮১)।

চাকুরি

প্রশ্ন (৩৪) : আমি একটা হাইস্কুলে চাকুরি করি, এখানে পরুষ ও মহিলা স্টাফদের বসার আলাদা ব্যবস্থা নাই। একরুমেই বসতে হয় এবং প্রয়োজনে মহিলাদের সাথে কথা বলতে হয় ও তাকাতেও হয়, আমার চাকুরি ছাড়াও সম্ভব নয়, এটা কি শরীয়তসম্মত হচ্ছে? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তবে আমার করণীয় কি?

-সেকেন্দার আলী
ভানসীপাড়া, বাগমারা।

উত্তর: বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার একটি ক্ষেত্র হচ্ছে সহশিক্ষা ব্যবস্থা। আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা শরীআতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বরং এক্ষেত্রে অবাধ মেলা-মেশার সকল পথ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবাধ মেলা-মেশা বন্ধের জন্য মহান আল্লাহ নারীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ অর্থাৎ 'তারা যেন তাদের বাড়িতে অবস্থান করে'। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলে' (তিরমিযী, হা/১১৭৩ 'সনদ ছহীহ'; মিশকাত, হা/৩১০৯)। অত্র হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারী পর্দাবিহীন অবস্থায় বের হলে শয়তান তাকে পাপের উপর ক্ষিপ্ত করে'। নারী-পুরুষের সহবস্থানের ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হলে তৃতীয় জন হবে শয়তান' (তিরমিযী, ১১৭৩; 'সনদ ছহীহ' মিশকাত, হা/১৩১৮)। অত্র হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে অপর কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং শয়তান তাদেরকে বিপদগামী করবে বলে সাবধান করেছেন। সুতরাং এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি না করে বৈধ পন্থায় ভিন্ন পথে রিযিক্ব অন্বেষণ করতে হবে। কেননা আল্লাহর জমিন প্রশস্ত।

প্রশ্ন (৩৫) : সরকারী পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং সরকারী সমবায় অফিসে চাকুরি করা যাবে কি?

-মো: আসিফ ইকবাল
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: যদি কোনো এনজিও, সংস্থা, অধিদপ্তর শরী'আত বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না থাকে, তাহলে সেখানে চাকুরি করাতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সর্বোত্তম উপার্জন কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মানুষ নিজ হাতে যা উপার্জন করে (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৬৫)। অত্র হাদীছে বুঝা যায় হালাল পন্থায় চাকুরি করা বৈধ। কিন্তু তা যদি শরী'আত বহিভূর্ত কর্মকাণ্ড; যেমন সূদ, পরিবার পরিকল্পনা, তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচারে উৎসাহিত করার মতো কোনো কাজে জড়িত থাকে, তাহলে সেখানে চাকুরি করা যাবে না। কেননা সূদ, যৌনাচার, প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইসলামে হারাম। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূদ গ্রহীতা, দাতা, তার লেখক ও সাক্ষ্যদাতার প্রতি লা'নত করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; মিশকাত, হা/২৮০৭)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা বিবাহ করো। কেননা আমি ক্বিয়ামতের দিন উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করবো (আবূ দাঊদ, হা/২০৫০; ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৪৪)। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে খাদ্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক্ব দিয়ে থাকি' (আল-ইসরা, ১৭/৩১)। অনুরূপ যৌনাচারও হারাম। আর এসব এনজিওতে চাকুরি করার মাধ্যমে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয় এবং শরীআত বিরোধী কাজকেই সমর্থন করা হয়, যা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও আল্লাহ দ্রোহিতার কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

বিদআত-কুসংস্কার

প্রশ্ন (৩৬) : দিবস পালন করা কি শিরক নাকি বিদআত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তর: দিবস পালন করার মানসিকতা একটি সামাজিক কুসংস্কার। দিবস পালন বলতে মানুষ একটি নির্ধারিত দিনে কিছু করতে চায়। যেমন: জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে মানুষ আনন্দ করে, শোক পালন করে, খানা-পিনার ব্যবস্থা করে। ঠিক তেমনি নির্ধারিত দিনে মানুষ তাদের বড় সফলতা এসেছে বলে সেদিন নানা ধরনের অনুষ্ঠান পালন করে থাকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ইত্যাদি বন্ধ রাখে। এরকম নির্ধারিত দিনকে কল্যাণকর মনে করা এবং সেই লক্ষ্যে কিছু করা শিরকের অন্তভুর্ক্ত। আবু ওয়াক্বিদ লাইছী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে বের হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের এমন একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাতে নিজেদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত। উক্ত বৃক্ষটিকে 'যাতু আনওয়াত্ব' বলা হত। এটা দেখে কোন কোন নব্য মুসলিম বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সমস্ত মুশরিকদের ন্যায় আমাদের জন্যও একটি 'যাতু আনওয়াত্ব' নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! মূসা আলাইহিস সালাম-এর কওম তাঁকে বলেছিল, আমাদের জন্য এরূপ মা'বূদ নিধার্রণ করে দিন, যেরূপ ঐ কাফের সম্প্রদায়ের মা'বূদ রয়েছে। তোমরাও তো সেরূপ কথা বলছো। সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের পথ অনুসরণ করে চলবে, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে' (তিরমিযী, হা/২১৮০; মিশকাত, হা/৫৪০৮)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, কোন নির্ধারিত দিনের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করা বা কোন কিছু মনে করে সে দিন পালন করা শিরক। তবে যদি দিবস পালনের পিছনে কোন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কিছু হওয়ার নিয়্যাত না থাকে এবং দিবসকে সম্মান করার বিষয়ও না থাকে এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে দিবস পালন করে তাহলে সেটি শিরক না হলেও হারাম হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদীনায় আসলেন, তখন দেখলেন মক্কার লোকেরা দু'টি দিনে খেলাধুলা করে। তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এ দু'টি দিন কী? তারা বলল, আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগ থেকেই এ দু'টি দিন পালন করে আসছি। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

সে দু'টি দিনকে বাতিল করে মুসলিমদের জন্য দু'টি দিন নির্ধারণ করলেন তাদের খেলাধুলা, আনন্দ ও যিকিরের জন্য। তার একটি হল, ঈদুল ফিতর আর অন্যটি ঈদুল আযহা (আবু দাঊদ, হা/১১৩৪; মিশকাত, হা/১৪৩৯)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে মুসলিমদের জন্য এ দু'টি দিন ছাড়া আর কোন দিন পালনীয় হতে পারে না। আর কোন দিন পালনীয় হলে তা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমাদের দু'দিন আর আমার পক্ষ থেকে দু'দিন। কিন্তু তিনি তা না করে মদিনাবাসীর দুই দিনকে বাতিল করে নতুন দুটি দিন দিয়েছেন। যার মাধ্যমে অন্য কোন দিবস পালনের সুযোগ আর ইসলামে নাই।

প্রশ্ন (৩৭) : অন্য মানুষকে ভুল করে লাথি লেগে গেলে করণীয় কী?

-মোহাম্মদ রাহুল ইসলাম
দুর্গাপুর রাজশাহী।

উত্তর: অসতর্কতা কিংবা ভুলবসত কোনো ব্যক্তির শরীরে লাথি লেগে গেলে করনীয় কিছু নেই। তবে, সামাজিকভাবে তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে। আর কুরআন, হাদীছ, ধর্মীয় ও সাধারণ কোন গ্রন্থে পা লাগলে তাতে সালাম কিংবা চুমু খাওয়ার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীছের ক্ষেত্রে সতকর্তা অবলম্বন করা জরুরি। তাকে পৃথক স্থানে রাখতে হবে। অসর্তকতার কারণে এমনটি হলে তা কুরআনকে অবমূল্যায়নের শামিল। তবে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বলা যায়। কেননা যেকোনো মছীবতে এটি বলা যায় (আল-বাক্বারা, ১৫৬; বুখারী, অধ্যায়-৪১)।

প্রশ্ন (৩৮) : ভালোবাসা দিবস পালন করার বিধান কী?

-নোমান
চট্টগ্রাম।

উত্তর: প্রথমত, বিশ্ব ভালবাসা দিবস পালন একটি রোমান জাহেলি উৎসব। রোমানরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও এ দিবস পালনের প্রথা অব্যাহত রাখে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পাদ্রির মৃত্যুদণ্ডের সাথে এ উৎসবটি সম্পৃক্ত। বিধর্মীরা এখনো এ দিবসটি পালন করে, ব্যভিচার ও অনাচারের মধ্যে তারা এ দিবসটি কাটিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের কোন উৎসব পালন করা জায়েয নয়। কেননা, ইসলামী শরীআতে উৎসব দিবস হিসেবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ দুটি দিবস স্বীকৃত। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে দেখতে পেলেন যে, তারা দুদিনে খেলাধুলা-উৎসব পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ দুটি কীসের দিবস? তারা বলল, আমরা জাহেলী যুগ থেকে এদুদিনে উৎসব পালন করে আসছি। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ দুদিনের পরিবর্তে উত্তম দুটি দিবস দান করেছেন, তা হলো- ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন (আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; মিশকাত, হা/১৪৩৯)। আর কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো দ্বীন মনে করে পালন না করলেও তা পালন করা নিষিদ্ধ। কেননা সেগুলো বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচারের সাথে মিলে যায়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে, সে তাদের দলভুক্ত' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)। আর ভালোসা দিবস নামে যে দিবস পালন করা হয় তা যেনার দ্বার উম্মোচন করে দেয় যা সম্পূর্ণ হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যিনার ধারে কাছে যেয়ো না। নিশ্চয় এটি অশ্লিল ও বেলেল্লাপনার কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' (সূরা বনূ ইসরাঈল, ১৭/৩২)।

প্রশ্ন (৩৯) : শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষে বিভিন্ন মসজিদ ও দোকানপাটে আলোকসজ্জা করা হয়, পটকা ফুটানো হয় ও আতশবাজি করা হয়। সেই সাথে হালুয়া-রুটি, খিচুড়ি ইত্যাদি খাবারের আয়োজন করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী জানতে চাই?।

-দিনাজপুর
শরি'য়তপুর।

উত্তর: আলোকসজ্জা করা বারামিকা সম্প্রদায়ের কাজ। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কাজ। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে, সে তাদের দলভুক্ত' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)। পটকা ফুটানো ও আতশবাজি করা মুসলিমদের কষ্ট দেয়ার নামান্তর এবং এগুলো অপচয়ের শামিল। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না' (আ'রাফ, ৭/৩১)। হালুয়া-রুটি খাওয়ার যে দলিল পেশ করা হয় তা ভিত্তিহীন।

কুরবানী-আক্বীকা

প্রশ্ন (৪০) : আক্বীকার দিনে শিশু কন্যার মাথা মুণ্ডন করার হুকুম কী? নিচের দু'আটি কি সঠিক? 'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া-লাকা আক্বীকাতু ফুলানিন'।

-আহিজুদ্দীন
আসাম, ভারত।

উত্তর : **(ক)** : আক্বীকার দিন নবজাত শিশুর মাথা মুণ্ডন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে কন্যা ও পুত্র সন্তানের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আমের আদ-দাব্বী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'শিশুর জন্মের সাথে আক্বীকা (অঙ্গাঙ্গিভাবে) জড়িত। সুতরাং তার পক্ষ হতে তোমরা রক্ত প্রবাহিত (যবেহ) করো। আর তার শরীর হতে ময়লা দূর করে দাও' (অর্থাৎ মাথার চুল মুণ্ডন করে দাও) (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৭; তিরমিযী, হা/১৫১৫; আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৯)। **(খ)** : বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা যথেষ্ট। তবে প্রশ্নোল্লেখিত দু'আটি আক্বীকার সময় পাঠ করা যায়। ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর পশু যবেহর সময় যেভাবে নাম উল্লেখ করা হয় তদ্রূপ আক্বীকার

ক্ষেত্রেও যেন উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এইভাবে যেন বলা হয় بِسْمِ اللهِ ، عَقِيقَةُ فُلاَنٍ ‘বিসমিল্লাহি আক্বীকাতু ফলানিন’ (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৪৭৫৩)। অপর বর্ণনায় দু’আটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَقِيقَةُ فُلاَنٍ ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ‘আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া-লাকা আক্বীকাতু ফুলানিন’ বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার’ (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৪৭৫৪; নায়লুল আওতার, ৫/১৫১ পৃ.)। উল্লেখ্য যে, ফুলানিন শব্দের স্থানে শিশুর নাম উল্লেখ করবে।

প্রশ্ন (৪১) : আক্বীকার গোশত ৭ দিন পরে খাওয়া যাবে কি?

-মো. রাকিব সরদার
ঢাকা।

উত্তর: আক্বীকার গোশত সাধারণ গোশতের ন্যায়। তাই ৭ দিন পরে খেলেও তাতে সমস্যা নেই। কারণ, এ ব্যাপারে কোনো নিষেধ আরোপিত হয়নি। বরং খাওয়ার ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে (নাসাঈ, হা/৪৪৩১)। তাই আক্বীকার গোশত ৭ দিন পরেও খেতে পারে।

চিকিৎসা-ঝাড়ফুঁক

প্রশ্ন (৪২) : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে, কেউ ভয় পেলে কাসার থালা বা প্লেটে দুআ পড়ে ফুঁক দিয়ে তার পিঠের উপর লাগিয়ে দেয়। যদি সে ভয় পেয়ে থাকে তাহলে, প্লেট তার পিঠে লেগে থাকবে এবং সম্পূর্ণ ভয় না উঠা পর্যন্ত প্লেট পড়বে না। আর ভয় না পেলে পিঠে লাগবে না পড়ে যাবে। এটা করলে কি শিরক হবে?

-রাজিয়া
রাজশাহী।

উত্তর: যে মন্ত্র পড়ে প্লেট লাগানো হয় তা যদি কোনো শিরকী বাক্য হয় তাহলে এমন আমল শিরকের অর্ন্তভুক্ত হবে। আর যদি শিরকী বাক্য না হয় তাহলে তা শিরকের অর্ন্তভুক্ত হবে না। তবে, এমন আমল শরীআত থেকে প্রমাণিত নয় তাই তা বর্জন করতে হবে। বরং কেউ ভয় পেলে শরীআত কর্তৃক প্রমাণিত আমলের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করতে হবে। ভয় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুআগুলো হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। (১) اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (২) اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (৩) اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا (আবূ দাঊদ, হা/১৫৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯৯৬; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৮২)।

প্রশ্ন (৪৩) : আমাদের দেশে গরু-ছাগল অসুস্থ হলে বা কোনো সবজির গাছে সবজির ফলন কমে গেলে পানি পড়ে দেওয়া হয়। এটা কি সঠিক?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
বালিয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: শারঈ ঝাড়ফুঁক জায়েয। সুতরাং মানুষ, গরু-ছাগল অসুস্থ হলে, ফলন কম হলে পানি পড়া দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ’তে বর্ণিত আয়াত ও দু’আগুলো পাঠ করা ও সেগুলো পাঠ করে ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে আরগ্য লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে যেকোনো শিরক মুক্ত দু’আ পাঠ করা যায়। রাসূল ﷺ বলেন, ‘ঝাড়ফুঁকের মধ্যে যখন শিরকের কিছু থাকবে না, তখন তা করাতে কোন ক্ষতি নেই (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০; মিশকাত, হা/৪৫৩০)।

প্রশ্ন (৪৪) : জিনেরা কি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে? যদি করে তাহলে জিনে ধরা রোগীর বাঁচার উপায় কী?

-কাওছার আহমাদ
দিনাজপুর।

উত্তর: জিনেরা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে কষ্ট দেয়। কখনো জিনেরা মানুষকে মেরে ফেলে। কখনো বা পাথর নিক্ষেপ করে এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়। জিনদের এ সকল কর্ম হাদীছ এবং বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯৭-৩২৯৮ ও ৩৩১০-৩৩১১)। নবী করীম ﷺ খন্দক যুদ্ধের দিন জনৈক ছাহাবীকে তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন। কারণ তিনি নতুন বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর যুবক ঘরে ফিরে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি তার প্রতি মনক্ষুণ্ন হলেন। স্ত্রী বললেন, ঘরে প্রবেশ করুন। ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন বিছানার উপরে একটি সাপ প্যাঁচ দিয়ে বসে আছে। যুবকটির হাতেই ছিল বর্শা। বর্শা দিয়ে সাপকে আঘাত করার সাথে সাথে সাপটি মারা গেল এবং উক্ত ছাহাবীও মৃত্যুবরণ করলেন। সাপ এবং ছাহাবীর মধ্যে কে আগে মারা গেল, তা জানা যায়নি। এই সংবাদ নবী করীম ﷺ-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি ঘরের মধ্যে বসবাসকারী পিঠের উপরে রেখা বিশিষ্ট এবং লেজহীন ছোট ছোট সাপগুলো ব্যতীত অন্যগুলো মারতে বললেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩৬; ফৎওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন-৪৩)। উক্ত ঘটনা এবং সূরা আল-বাক্বারার ২৭৫ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জিনেরা মানুষের উপরে আক্রমণ করে এবং নানাভাবে কষ্ট দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা সূদ খায়, তারা ক্বিয়ামতে দন্ডায়মান হবে যেভাবে দন্ডয়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে ভারসাম্যহীন পাগলের মত করে দেয়’ (আল-বাক্বারা, ২৭৫)। আর জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য হাদীছে বর্ণিত দু’আগুলো পাঠ করতে হবে। তার মধ্যে আয়াতুল কুরসী অন্যতম। রাসূল ﷺ বলেছেন, শয়নকালে যদি কেউ আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান (জিন) তার নিকটবর্তী হতে না পারে (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১; মিশকাত, হা/২১২৩)। এছাড়া সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত এবং সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পড়া যায়।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৫) : আমার বয়স সাতাশ বছর। আমি দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করার জন্য কুরআন, হাদীছের সাথে সাথে আরো কিছু কিতাব পড়ছি। এখন আমি বেকার। আমি কি এখন

কাজ খুঁজবো নাকি আরো কিছু জ্ঞান অর্জন করবো? কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

-ফযলে রাব্বি
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর: জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়াই উত্তম। আল্লাহ বলেছেন, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি উভয়ে সমান হতে পারে' (আয-যুমার, ৩৯/৯)। (২) 'তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (আল-আলাক্ব, ৯৬/১)। (৩) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জ্ঞান অর্জনের খোঁজে কোনো পথ চলবে, তাহলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন (আবূ দাউদ, হা/৩৬৪১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৯৭)। (৪) নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, লোক নিজ হাতে যা উপার্জন করে (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৬৫)। উক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ হতে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান অর্জন করা যেমন গুরত্বপূর্ণ তেমন নিজ হাতে উপার্জন করে ভক্ষন করাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনার উচিত হবে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি কর্ম ক্ষেত্রে লেগে যাওয়া।

প্রশ্ন (৪৬) : মানুষের মত কি জিনদেরও সংসার জীবন ও হায়াত-মউত আছে?

-আনোয়ার হোসেন জসিম
পূর্বধলা, নেত্রকোণা।

উত্তর: হ্যাঁ, জিনদেরও সংসার জীবন ও হায়াত-মওত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য' (যারিয়াত, ৫১/৫৬)। তিনি আরো বলেন, 'আমি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা থেকে জিন সৃষ্টি করেছি' (সূরা হুজুরাত, ১৫/২৭)। এ আয়াত থেকে বুঝা গেল জিনদের অস্তিত্ব বা জীবন রয়েছে। তাদের মধ্যেও আমাদের মতো নারী ও পুরুষ রয়েছে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি এ দুআ পাঠ করতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নারী ও পুরুষ বদ জিন থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি' (ছহীহ বুখারী, হ/৬৩২২; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৫)। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় জিনেরা নারী ও পুরুষ এ দুই শ্রেণির হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'সেখানে তাদের জন্য থাকবে অবনত নয়না হুর যাদের সাথে ইতোপূর্বে না কোনো মানুষ সঙ্গম করেছে না কোনো জিন' (সূরা আর-রাহমান, ৫৫/৫৬)। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনেরাও সহবাস করে। যখন সহবাস করা বিষয়টি স্পষ্ট, তখন তাদের সংসার ও বংশ বৃদ্ধির কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের মতো তাদের মৃত্যু হয়ে থাকে; শুধু জিন ও ইনসান নয়; রবং সকল প্রাণিকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, প্রতিটি প্রাণি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে... (আলে ইমরান, ৩/১৮৫)।

প্রশ্ন (৪৭) : ইসলাম কি নারী যোদ্ধাকে সমর্থন করে? আর কোনো নারী ছাহাবী কি কখনো যুদ্ধ করেছিলেন?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: নারীরা সারাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তবে তারা যুদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে যেতেন এবং যোদ্ধাদের খাবার-পানীয়, তাদের মধ্যে যারা আহত হতেন তাদের সেবা-শুশ্রূষা প্রদান ইত্যাদি সেবামূলক কাজগুলোর মাধ্যমে যোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম, আয়েশা বিনতু আবূ বকর ও উম্মু সুলাইম রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের গহনা দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বয়ে ছাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭২৪)। এটি পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা ছিল। উল্লেখ্য যে, আত্মরক্ষার জন্য অতর্কিত কোনো আক্রমণ শুরু হলে, সেক্ষেত্রে নারীরা যুদ্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন (৪৮) : বর্তমানে বিপিএল ক্রিকেট খেলা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় ভরপুর। এই খেলা দেখা জায়েয হবে কি?

-নাসরুল্লাহ
বাগেরহাট, খুলনা।

উত্তর : ক্রিকেটসহ বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সকল খেলাই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। তাছাড়া এতে যে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা চলছে তা যেনার শামিল। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক (আল-মায়েদা, ৯০)।

প্রশ্ন (৪৯) : বিড়াল মেরে ফেললে তার ওযনের সমপরিমাণ লবণ ছাদাক্বা করে তাকে পুঁতে ফেলতে হবে- একথা কি ঠিক?

-মাহমুদুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর: এ ধরনের কথা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। তাছাড়া কোন প্রাণীকে সাধারণত মেরে ফেলা উচিত নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৩; মিশকাত, হা/৪৬৭৮)। বিড়াল মেরে ফেলার কারণে এক মহিলা জাহান্নামী হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৫)।

প্রশ্ন (৫০) : আমার মায়ের জমি আছে। সেই জমি আমার বাবা চাষ করেন। আমার মা যদি প্রয়োজনে বাবাকে না বলে সেই জমির অল্প কিছু ধান বিক্রি করে তাহলে পাপ হবে কি?

-রাজিয়া
রাজশাহী।

উত্তর: স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পদ স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ

করতে পারে। কেননা সম্পদ তার সেহেতু খরচ করার তার অধিকার রয়েছে। এ জন্য স্বামীর অনুমতি জরুরী নয়। মায়মূনা বিনতু হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি ব্যতীত তিনি আপন বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তার ঘরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি জানেন না আমি আমার বাঁদী মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি তা করেছ? মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'শুন! তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে, তাহলে তোমার জন্য বেশি নেকীর কাজ হত (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৫২)। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের ছালাত আদায় করার পর খুৎবা দিয়ে নারীদের নিকট আসলেন এবং তাদেরকে দান করার জন্য বললেন, তখন নারীরা তাদের অলংকারসমূহ থেকে দান করতে আরম্ভ করলেন (সংক্ষিপ্ত) (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৫)। উল্লেখিত হাদীছদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্ত্রী তার নিজের সম্পদ স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করতে পারে। তবে, স্বামীর সাথে পরামর্শ করে খরচ করা ভালো।

'সম্পাদকীয়'-এর বাকী অংশ

আরব জাতি একটি বক্তব্যপ্রবণ জাতি। বাচনভঙ্গি ও বক্তৃতার বৈশিষ্ট্যে তারা অনন্য। আরবী ভাষা এমন একটি ভাষা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরব সংস্কৃতিকে জীবন্ত রেখেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আরব জাতির যোগাযোগের সেতুবন্ধন হয়ে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে অবস্থান করেও এর মাধ্যমেই প্রাচীন ও বর্তমান আরবের মুসলিমগণ একতাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করে। সে জিহ্বা দিয়ে কথা বললেও তার চিন্তাভাবনা, গতিবিধি এবং আবেগকে এক ভাষার ফ্রেমে আবদ্ধ করে রাখে; ভূখণ্ড, অঞ্চল ও দেশের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও *(আল-লুগা আরাবিয়া ওয়া মাকানাতুহা বায়নাল লুগাত, ১/২)*।

আরবী ভাষা আরব জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এটি তাদের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুগযুগ ধরে চলমান আছে। আরবী একটি বিশাল মানব সভ্যতার ভাষা হতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন জাতি অংশগ্রহণ করেছিল। আরবরা ছিল এর মৌলিক নেয়ামক এবং এর জাহাজের পথপ্রদর্শক। তারা সবাই একে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা বলে মনে করত, তাই এটি বিজ্ঞান, রাজনীতি, বাণিজ্য, আইন, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, সাহিত্য এবং শিল্পের ভাষা হতে সক্ষম হয়েছিল *(আল-লুগা আরাবিয়া ওয়া মাকানাতুহা বায়নাল লুগাত, ১/৩)*।

জাতির ভাষা তার ঐক্যের ভিত্তি, তার সভ্যতার দর্পণ এবং তার জীবনবিধানের অলৌকিকতার বহিঃপ্রকাশক। আল-কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার মাধ্যমে আরবী ভাষা অলৌকিকতার পোশাকে আবৃত হয়। কোটি কোটি মানুষ আরবী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করে যা তাদের ভাষাকে পবিত্র ও গর্বিত করে। ফরাসী আর্নেস্ট রেনান বলেছেন, 'আরবী ভাষা হঠাৎ করে খুব নিখুঁত হতে শুরু করেছে এবং এটি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা। এতে শৈশব বা বার্ধক্য নেই' *(আল-ইরতিকাউ বিল আরাবিয়া ফী ওয়াসাইলিল ই'লাম, নূরুদ্দীন বিলবিল, কিতাবুল উম্মাত, ৮৩ সংখ্যা, রজব ১৪২২ হি.)*। জার্মান ফ্রেইটাগ বলেছেন, 'আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ভাষা' *(আল-লুগা আরাবিয়া ওয়া মাকানাতুহা বায়নাল লুগাত, ১/৪)*। উইলিয়াম ওয়ার্ক বলেছেন, 'আরবী একটি মনোরম ভাষা যা যুগের আলোকে খাপ খেয়ে যায়' *(আল-লুগা আরাবিয়া ওয়া মাকানাতুহা বায়নাল লুগাত, ১/৪)*। ড. আব্দুল ওয়াহাব গ্রাম বলেছেন, 'আরবী একটি সম্পূর্ণ, মনোরম, বিস্ময়কর ভাষা, এর শব্দগুলো প্রায় প্রকৃতির দৃশ্যগুলোকে চিত্রিত করে, এর শব্দগুলো আত্মার চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে এবং এর অর্থ শব্দের ঝংকারে পরিস্ফুটিত হয়, যেন এর শব্দগুলো বিবেকের ধাপ, হৃদয়ের স্পন্দন এবং জীবনের সুর' *(আল-লুগা আরাবিয়া ওয়া মাকানাতুহা বায়নাল লুগাত, ১/৪)*।

ড. তাহা হুসাইন বলেছেন, 'যে আরব বুদ্ধিজীবীরা তাদের ভাষা আয়ত্ত করতে পারেননি এটা তাদের কেবল সংস্কৃতিগত ঘাটতিই নয়, বরং তাদের পুরুষত্বেরও একটি বড় এবং অপমানজনক ঘাটতি' *(আল-লুগা আরাবিয়া ওয়া মাকানাতুহা বায়নাল লুগাত, ১/৪)*। আরবী ভাষা পাঁচটি আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যে একটি। এর মাহাত্ম্য এতেই প্রকাশ পায় যে এটি কুরআনের ভাষা, যেখানে তিনি বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে আমরা কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা বোঝে' *(ইউসুফ, ১২/২)*।

অতএব, ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা দেখাতে হবে এবং আরবীকে আল-কুরআনের ভাষা হিসেবে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। তবেই ভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আংশিকভাবে পালিত হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
  বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :

- বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
  বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :

- নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
  বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

- নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
  নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
  রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :

- আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
  বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
  বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাফী কনফারেন্স ২০২২-২৩

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

২য় বার্ষিক
দিনাজপুর
৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
সময়: জুমু'আহর খুতবার মধ্য দিয়ে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

৭ম বার্ষিক
ঢাকা
২ ও ৩ মার্চ, ২০২৩
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
হাটাব, বীর-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতিত্ব করবেন
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল ও দিনাজপুর
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বক্তব্য পেশ করবেন:
দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
মিডিয়া পার্টনার মাসিক আল-ইতিছাম, Al-Itisam TV

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

সার্বিক সহযোগিতায় নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
হাটাব, বীর-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

রেজিস্ট্রেশন এর শেষ তারিখ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ইতিছাম পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২২
১৭ পরিক্ষার তারিখ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ ফ্রি
পুরস্কারসমূহ ১৬৫টি
১ম পুরস্কার নগদ ৩০,০০০/- এবং ক্রেস্ট+সনদ
২য় পুরস্কার নগদ ২৫,০০০/- এবং ক্রেস্ট+সনদ
৩য় পুরস্কার নগদ ২০,০০০/- এবং ক্রেস্ট+সনদ
৪র্থ পুরস্কার নগদ ১৫,০০০/-
সর্বমোট ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার
৫ম পুরস্কার নগদ ১০,০০০/-
৬ষ্ঠ পুরস্কার নগদ ৫,০০০/- (১০টি)
৭ম পুরস্কার ১ বছরের মাসিক আল-ইতিছাম এর ফ্রি গ্রাহক সুবিধা (৫০টি)
৮ম পুরস্কার ৬ মাসের মাসিক আল-ইতিছাম এর ফ্রি গ্রাহক সুবিধা (১০০টি)
বিষয়: মাসিক আল-ইতিছাম ৬ষ্ঠ বর্ষ (নভেম্বর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২২ সংখ্যা)
৬ষ্ঠ বর্ষ একসাথে বোর্ড বাইন্ডিং পেতে অর্ডার করুন: ০১৪০৭-০২১৮৪০
০১৭৫০-১২৪৪৯০ (বিকাশ পার্সোনাল)
নিয়মাবলি
রেজিস্টেশন লিংক: al-itisam.com/প্রতিযোগিতা
অথবা স্ক্যান করুন
রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার বিকাল ৪টায় অনলাইনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ৩০ মিনিট পূর্বে রেজিস্ট্রেশনে প্রাপ্ত মোবাইল নাম্বারে পরীক্ষার লিংক এসএমএস পাঠানো হবে। ঠিক ৪টায় প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে।
MCQ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।পরীক্ষার সময়: ৬০ মিনিট; মোট প্রশ্ন: ১০০টি; পূর্ণমান:১০০। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ফলাফল ঘোষণা : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
পুরস্কার বিতরণ : ৩ মার্চ ২০২৩, সালাফী কনফারেন্স-২০২৩, নারায়ণগঞ্জ।
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৪০৭-০২১৮৪০
আয়োজনে: নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এস-১২২৮৮-২০১৬)
সহযোগিতায়
মাসিক আল-ইতিছাম
Al-Itisam

BONOJO
Organic BONOJO
bonojobd.com
01704550806
/bonojobd
সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু
চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু